বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৫৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ—ভাদ্র, ১৩৫৬
তৃতীয় মুদ্রণ—পৌষ, ১৩৫৬
চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৩৫৭
পঞ্চম মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৫৭
ষষ্ঠ মুদ্রণ—চৈত্র, ১৩৫৭

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স,
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও,
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা আট আনা

বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় 'যাযাবর,'

নানাবিধ ব্যবধান, বিরোধ ও বৈষম্য সত্বেও আপনি এবং আমি গত অনেকগুলি বৎসর মধুর প্রীতি এবং নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুত্বের সঙ্গে কাটিয়েছি। সেই বন্ধুত্ব আজো সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ আছে। সেই বন্ধুত্ব ভবিষ্যতেও অক্ষুণ্ণ থাকবে এই কামনা নিয়েই "শীতে উপেক্ষিতা" আপনাকে দিতে চাই। আশা করি আমাদের বন্ধুত্ব এই কঠোর পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হবে!

আর সবাই এ-বইয়ের সাহিত্যিক মূল্য বিচার করুক। আপনি শুধু আমার প্রীতির নিদর্শনরূপে একে গ্রহণ করুন। আমাদের বন্ধুত্বই এই বই আপনাকে দেবার যথেষ্ট কারণ।

বইটি যখন 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তখন বহু সহৃদয় পাঠক একে আপনার রচনা বলে মনে করে সম্পাদক মহাশয়কে পত্রদান করেছেন বলে শুনেছি। এত সংখ্যক পাঠক যখন আমাদের রচনা-রীতিতে সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন তখন তাকে পুরোপুরি অমূলক বলে উড়িয়ে দেবার ঔদ্ধত্য আমার নেই। কিন্তু আমি নিজে মূলগত কোনো সাদৃশ্য দেখতে পাইনে। আপনার ভাষার ছন্দসমৃদ্ধ সাবলীলতা, আপনার দৃষ্টির মতামতশূন্য স্বচ্ছতা,

আপনার লঘু রসবোধ ইত্যাদির কিছুই নেই "শীতে উপেক্ষিতা"-য়। অপর পক্ষে "শীতে উপেক্ষিতা"-র—, —এবং—, নেই 'দৃষ্টিপাতে'। এ দুয়ের প্রভেদ, আমার মতে, অত্যন্ত বৃহৎ। পূরো বইখানি পড়লে আরো অনেকে এই ধারণা সমর্থন করবেন বলে আশা করব।

আপনার এবং আমার পরিচিত কয়েকজনের কাছে আমাদের উভয়েরই এমন ইঙ্গিতও শুনতে হয়েছে যে 'দৃষ্টিপাত' আমার লেখা। এমন কথা যাঁরা বলেছেন তাঁরা আপনারও সম্মান করেননি, আমারও না। প্রুফ্ দেখা এবং অন্যান্য দুয়েকটা গৌণ বিষয়ে আপনার "দৃষ্টিপাত" লেখায় সাহায্য করেছিলেম বলে এবং, প্রধানত, আপনার সহজাত বিনয় বশত আপনি উপরোক্ত ইঙ্গিতের তীব্র প্রতিবাদ করেননি। আমি তাই করবার সুযোগ পাব বলে এই পত্রাকার ভূমিকা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

"শীতে উপেক্ষিতা" আপনার লেখা বা "দৃষ্টিপাত" আমার, আশা করি এরকম কথা আর শুনতে হবে না। একটা হাসির গল্প বলি শুনুন।

হাউস্‌ম্যান ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা আপনি জানেন। কে যেন একজনের লেখা আরেক জনের বলে ভুল করেছিল। তখন একদিন এ, ঈ, হাউসম্যান লরেন্স্‌কে লিখলেন, "I would rather you were thought to have written my books than that I were thought to have written yours."

এইটেই আমারও কথা। আমার সন্দেহ নেই যে আপনারও। অতএব, আসুন, আর যা বলে বলুক অন্য লোক, আপনি এবং আমি হাসতেই থাকি।

কলকাতা
১ বৈশাখ, ১৩৫৬

প্রীতিমুগ্ধ
"রঞ্জন"

দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

প্রথম প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে আমার বন্ধু যাযাবরের প্রতি যে কিঞ্চিৎ অসৌজন্যের আভাস ছিল সে সম্বন্ধে আমি নিজে একেবারে অজ্ঞান ছিলেম না। কিন্তু আমাকে বেছে নিতে হয়েছিল অসাধুতা আর অসৌজন্যের মধ্যে। কেবলমাত্র *Caveat Emptor* নীতির উপর ছেড়ে দিয়ে বিনা ভূমিকায় "শীতে উপেক্ষিতা" প্রকাশ করলে আমি নিজে অন্তত নিজেকে ক্ষমা করতে পারতেম না। ঠিক একই কারণে প্রথম সংস্করণের ভূমিকা দ্বিতীয় মুদ্রণ থেকে প্রত্যাহার করলেম না।

তার সঙ্গে শুধু একটা কথা যোগ করব। প্রথম ভূমিকা সত্ত্বেও যে আমাদের বন্ধুত্ব পরিপূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ আছে এটা আমার বা তাঁর সাহিত্যিক সাফল্য-অসাফল্যের চাইতে অনেক বড়ো কথা। আমি নিজে বন্ধুত্বকে জীবনের অনেক কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিই, এবং আমার বন্ধুও যে তাই দেন সে কথা প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করবার সুযোগ লাভ করে সুখী হলেম।

"শীতে উপেক্ষিতা-"র আপাত-দুর্বোধতা ও আপাত-উন্নাসিকতা সত্ত্বেও যে প্রকাশের এত অল্পকালের মধ্যেই এতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সে জন্যে পাঠকসমাজের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পরে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করায় যে বিলম্ব ঘটল তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ইতি।

কলিকাতা
২৭ শ্রাবণ, ১৩৫৬

"রঞ্জন"

প্রকাশকের নিবেদন

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নূতন লেখক "রঞ্জন"-এর "শীতে উপেক্ষিতা" যে আশাতীত জনপ্রিয়তা অর্জন করে তাহাতে অতি অল্প কালের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। পরবর্তী সংস্করণের প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রণসংখ্যা দ্বিগুণ করিয়াছিলাম। তৎ-সত্ত্বেও অতি দ্রুত তৃতীয় মুদ্রণের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার প্রকাশেও কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল এবং তজ্জনিত পূর্বানুরূপ অসুবিধার জন্য পাঠক সমাজের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

১ বৈশাখ, ১৩৫৭

বেঙ্গল পাবলিশার্স

এক

মুমূর্ষু সরীসৃপটা যেন পুনরুজ্জীবিত হোলো। স্টেশনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ প্ল্যাটফরমের বিশাল পরিধিতে পরিব্যাপ্ত যে অগণিত জনতার কোলাহল এতক্ষণ শোকার্তের আর্তনাদের মতো সকলের কর্ণপীড়ার কারণ হয়েছিল, ক্রমে তাও প্রায় নিমজ্জিত হয়ে গেল এঞ্জিনের বেসুরো আসুরিক আওয়াজে। দীর্ঘ, স্থাণু লৌহকক্ষ-সমষ্টির পঞ্জরে এলো দুরন্ত প্রাণের স্পন্দন, শোনা গেল আসন্ন গতির বৃহৎ গর্জন। কর্কশ ঘণ্টাধ্বনিতে খণ্ডিত হোলো বহু জনের বিদায় সম্ভাষণ, ব্যাহত হোলো বহু জনের ব্যবসায়িক বার্ত্তা-বিনিময়। অনেকের হয়তো অনেক কিছু থেকে গেল অকথিত, কিন্তু শিয়ালদহ স্টেশনের বৈদ্যুতিক ঘড়ি তার খবর নেয় না। সে চলে আপন নিয়মে, আর তারই নির্দেশে চলে রেলগাড়ি। নীল সার্জের য়ুনিফর্ম পরিহিত গার্ডের বাঁশি ও আলোর সংকেতে সরীসৃপ অপসৃত হোলো ধীর গতিতে, অপেক্ষমান ব্যক্তি সমূহের অসমাপ্ত কাহিনীর প্রতি নির্দয় ঔদাসীন্যে।

এই বিদায়ের ক্ষণটি আমার মনে বড়ো বেদনাবিধুর হয়ে বাজে। যে জনসমাগমকে আমার পশ্চাতে রেখে এলেম তার এক জনের সঙ্গেও আমার মুহূর্ত মাত্রেরও পরিচয় ছিল না,

দ্বিতীয় সাক্ষাতে তাদের এক জনকেও অপর জন থেকে পৃথক্ করে চিহ্নিত করতে পারব না, কিন্তু তবু কী যেন একটা অকারণ বিদায় বোধ আমার মনকে আচ্ছন্ন করে প্রতি যাত্রার প্রাক্কালে!

রাজনীতিতে আমি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিবিশ্বাসী। জনতা সম্বন্ধে আমার ভীতি মজ্জাগত। সাম্যবাদীদের গণদেবতার জয়গানে আমি জীবনে কখনো কণ্ঠযোগ করিনি, বহুকে আমি কখনোই বিশেষের ঊর্ধ্বে স্থান দিইনি, সমষ্টিকে সর্বদাই ব্যষ্টির ব্যর্থতা বলে জ্ঞান করেছি। তবু কেন জানিনে, এই ডকে, স্টেশনে বা ঘাটে ফেলে যাওয়া জনতার জন্যে আমার মনে আছে একটা আন্তরিক মমত্ববোধ। এই ভীড়ের নৈকট্য আমার মনে আনে শংকিত সংকোচ। আমার মন বাস করে এই জনতার বহু দূরে স্থিত স্বকল্পিত এক শ্বেতদুর্গে, এদের শারীর সান্নিধ্য আমাকে দেয় একটা অতিশয় অস্বস্তিকর অনুভূতি, এই জনতার সঙ্গে আমার চরিত্র ও সংস্কৃতিগত ব্যবধান অপরিসীম, এর বুদ্ধি সম্বন্ধে আমার মন অশ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ, কিন্তু তবু একে রেখে যাওয়ার সময় আমার সমগ্র সত্তা যেন জানে যে কোন্ একটা অদৃশ্য বন্ধন ছিন্ন হোলো এই মুহূর্তে। বুদ্ধি দিয়ে এ-বোধের নাগাল পাইনে, কিন্তু তা বলে এর অস্তিত্বকে তো অস্বীকার করতে পারিনে।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেম এই সহসা জড়ীভূত জনতার দিকে। তার আকৃতি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে হতে ক্রমে সম্পূর্ণ ভাবে আমার দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হোলো। রেলগাড়ির গতিবৃদ্ধির সঙ্গে তার ধ্বনিতে সংযোজিত হোলো সেই অতি পরিচিত একঘেয়ে অতিবাধ্য সুরটা। সে-রাগিনীর জন্যে

বাক্যরচনা ছিল আমার শৈশবের প্রথম কাব্যপ্রচেষ্টা। গাড়ির চাকা আর লাইনের সংঘর্ষে যে সংগীতের সৃষ্টি হয় তাকে দিয়ে কখনো বলিয়েছি, 'তুমি যাও, আমি যাই,' কখনো বা মনে মনে শুনেছি রেল-লাইনের আপন মর্মবেদনা, 'আমি থাকি, তুমি যাও'। আজ যেন সেই ছেলেমানুষী কথার খেলায় শুনতে পেলেম স্টেশনের পরিচয়হীন জনতার ক্রন্দনধ্বনি। 'হায়, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।'

মৃত্যুতে আকস্মিকতার বিস্ময় আছে। দীর্ঘ, আরোগ্যাতীত অসুস্থতার ক্ষেত্রেও একেবারে চরম বিদায়ের মুহূর্তটা থাকে অজ্ঞাত। মৃত্যুজনিত বেদনার গভীরতা যতটা তার প্রতিকার-হীনতার জন্যে, প্রায় ততটাই বোধ হয় তার পূর্বজ্ঞানহীনতার জন্যে। কিন্তু গাড়ি-ছাড়া? তার বিদায় আর আগমনী তো পূর্বনির্ধারিত এবং পূর্বঘোষিত। বর্তমানে অস্থির-ব্যবস্থায় রেলগাড়ির আগমন যদি বা প্রায়শই বিলম্বিত হয়, গমনে ব্যতিক্রম ঘটে কদাচিৎ।

তবে কেন বেদনাবোধ? স্টেশনের বৃহদাকার ঘড়িটা প্রতি পলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছে, বলেছে, আর বাকি আছে পাঁচ মিনিট, চার মিনিট, তিন, দুই, এক। তবু কেন শেষ মুহূর্তের সেই বিয়োগব্যথা? পৃথিবীর অধিকাংশ কেন-র মতোই এ-প্রশ্নেরও সঙ্গত, যুক্তিসম্মত কোনো সদুত্তর নেই। প্রস্তুতিরও বিশেষ সার্থকতা নেই। যুদ্ধকালীন নিয়োগের অস্থায়িত্বের কথা তো জানা ছিল সকল কর্মচারীর, তবু কেন যুদ্ধাবসানে তাই নিয়ে ধর্মঘট? মানব-

জীবনের নশ্বরতার কথা শৈশবের পাঠ্যপুস্তকে মুখস্থ করেছে সবাই, তবু কেন প্রিয়জনের তিরোধান আনে সেই অসহনীয় শূন্যতা ?

বাহিরের চলমান ও ঘনায়মান অন্ধকারের ভয়াবহ গর্ভ থেকে চোখ সরিয়ে গাড়ির অভ্যন্তরে আনতেই সহযাত্রীদের সম্মিলিত কলস্বর কানে এলো। সে তো স্বর নয়, শোর। কথা নয়, কলহ। যে-কোনো বিদেশী সেখানে উপস্থিত থাকলে কালবিলম্ব না করে অ্যালার্ম চেন টানতে উদ্যত হোতো, গার্ড এলে বলতো: 'কী ব্যাপার বুঝতে পারিনি, কিন্তু কী যেন একটা বিষম বিরোধ বেধেছে এদের মধ্যে।' সামান্য অনুসন্ধানে অচিরেই আবিষ্কৃত হোতো যে বিরোধের বাষ্পমাত্র নেই, সহযাত্রীদের মধ্যে সৌজন্য-বিনিময় হচ্ছে মাত্র! অন্তরঙ্গতার তরঙ্গোৎক্ষেপকে যে-বিদেশী দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত বলে ভ্রম করতে পারতো, তাকে আর যে-ই দোষী সাব্যস্ত করুক আমি তার ফাঁসির হুকুম দিতে পারব না।

অথচ আমি শম্বুকস্বভাব ইংরেজ নই। ট্রামে-ট্রেনে আমি আমার চতুর্দিকে সংবাদপত্র বিস্তার করে এক সাময়িক দুর্গ রচনা করিনে রোজ সকালে। আমারও মনের তয়খানায় আছে একটা সঙ্গকামী, প্রীত্যর্থী বুভুক্ষু। বন্ধুত্বের উষ্ণতা আমারও হৃদয়কে স্পর্শ করে, সৌহার্দ্যের স্নিগ্ধতা আমারও মর্মে মধুরতা বর্ষণ করে, প্রীতির মাধুরী আমারও অন্তরকে জাগ্রত করে। দ্বীপমনা ইংরেজের মতো প্রতি অপরিচিতকেই আমি অরি জ্ঞান করিনে, প্রতি আগন্তুককেও কিছু সন্দেহভাজন মনে করিনে।

অজানাকে জানবার অভিলাষ আমারও আছে, কিন্তু দূরকে অতিনিকট করবার বেলায় আমি একটু সাবধানতার পক্ষপাতী। সম্ভাব্য কোনো প্রত্যক্ষ ক্ষতির আশংকা নেই সে দ্বিধার মূলে, আছে শুধু স্বভাবগত একটা উচ্ছ্বাসের অনাতিশয্য, চরিত্রগত একটা মাত্রাবোধ।

পরিচিতির বাইরের-ঘরে থাক বহু জন, অন্তরঙ্গতার অন্দরমহলে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র দিই অতি স্বল্পসংখ্যক, সমমানস বিশেষ কয়েক জনকে। আন্তরিক সেই সম্প্রীতির সম্পর্কটা উভয় পক্ষের অর্জনসাপেক্ষ, পারস্পরিক সেই বোঝা-পড়াটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়সাপেক্ষ। সহযাত্রিত্বের মতো আকস্মিক একটা ঘটনার পরিবেশে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে সারা জীবনের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রথম সাক্ষাৎ মিললো সেখানে—উপন্যাসে আর চলচ্চিত্রে এর দৃষ্টান্ত আছে বহু—কিন্তু সেটা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম। সহযাত্রীকে আমি তাই সহযাত্রী বলেই মনে করি, তার বেশি নয়। আকস্মিক সান্নিধ্যের সুযোগ নিয়ে নিজকে প্রক্ষিপ্ত করিনে অপরের উপর।

কিন্তু, হায়, ইতিহাসে অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে শান্তিকামী জাতির উপর প্রতিবেশী, আগ্রাসী রাষ্ট্রের আক্রমণের। ভারতবর্ষ তার ভদ্রতাবোধ নিয়ে হিন্দ্-পাকিস্তান সীমান্তের সম্মান রক্ষা করলেও অপরপক্ষ আন্তর্জাতিক ভব্যতাকে উপেক্ষা করে উর্দিবিরহিত বাহিনী প্রেরণ করতে পারে কাশ্মীরে আর জয়সালমারে। আমার সহযাত্রীরা পারে আমার নৈঃশব্দ্যের নির্দেশ না মেনে আমার ব্যক্তিগতের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ

জীবনের নশ্বরতার কথা শৈশবের পাঠ্যপুস্তকে মুখস্থ করেছে সবাই, তবু কেন প্রিয়জনের তিরোধান আনে সেই অসহনীয় শূন্যতা ?

বাহিরের চলমান ও ঘনায়মান অন্ধকারের ভয়াবহ গর্ভ থেকে চোখ সরিয়ে গাড়ির অভ্যন্তরে আনতেই সহযাত্রীদের সম্মিলিত কলস্বর কানে এলো ! সে তো স্বর নয়, শোর। কথা নয়, কলহ। যে-কোনো বিদেশী সেখানে উপস্থিত থাকলে কালবিলম্ব না করে অ্যালার্ম চেন টানতে উদ্যত হোতো, গার্ড এলে বলতো ঃ 'কী ব্যাপার বুঝতে পারিনি, কিন্তু কী যেন একটা বিষম বিরোধ বেধেছে এদের মধ্যে।' সামান্য অনুসন্ধানে অচিরেই আবিষ্কৃত হোতো যে বিরোধের বাষ্পমাত্র নেই, সহযাত্রীদের মধ্যে সৌজন্য-বিনিময় হচ্ছে মাত্র ! অন্তরঙ্গতার তরঙ্গোৎক্ষেপকে যে-বিদেশী দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত বলে ভ্রম করতে পারতো, তাকে আর যে-ই দোষী সাব্যস্ত করুক আমি তার ফাঁসির হুকুম দিতে পারব না।

অথচ আমি শম্বুকস্বভাব ইংরেজ নই। ট্রামে-ট্রেনে আমি আমার চতুর্দিকে সংবাদপত্র বিস্তার করে এক সাময়িক দুর্গ রচনা করিনে রোজ সকালে। আমারও মনের তয়খানায় আছে একটা সঙ্গকামী, প্রীত্যর্থী বুভুক্ষু। বন্ধুত্বের উষ্ণতা আমারও হৃদয়কে স্পর্শ করে, সৌহার্দ্যের স্নিগ্ধতা আমারও মর্মে মধুরতা বর্ষণ করে, প্রীতির মাধুরী আমারও অন্তরকে জাগ্রত করে। দ্বীপমনা ইংরেজের মতো প্রতি অপরিচিতকেই আমি অরি জ্ঞান করিনে, প্রতি আগন্তুককেও কিছু সন্দেহভাজন মনে করিনে।

অজানাকে জানবার অভিলাষ আমারও আছে, কিন্তু দূরকে অতিনিকট করবার বেলায় আমি একটু সাবধানতার পক্ষপাতী। সম্ভাব্য কোনো প্রত্যক্ষ ক্ষতির আশংকা নেই সে দ্বিধার মূলে, আছে শুধু স্বভাবগত একটা উচ্ছ্বাসের অনাতিশয্য, চরিত্রগত একটা মাত্রাবোধ।

পরিচিতির বাইরের-ঘরে থাক বহু জন, অন্তরঙ্গতার অন্দরমহলে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র দিই অতি স্বল্পসংখ্যক, সমমানস বিশেষ কয়েক জনকে। আন্তরিক সেই সম্প্রীতির সম্পর্কটা উভয় পক্ষের অর্জনসাপেক্ষ, পারস্পরিক সেই বোঝা-পড়াটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়সাপেক্ষ। সহযাত্রিত্বের মতো আকস্মিক একটা ঘটনার পরিবেশে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে সারা জীবনের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রথম সাক্ষাৎ মিললো সেখানে—উপন্যাসে আর চলচ্চিত্রে এর দৃষ্টান্ত আছে বহু—কিন্তু সেটা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম। সহযাত্রীকে আমি তাই সহযাত্রী বলেই মনে করি, তার বেশি নয়। আকস্মিক সান্নিধ্যের সুযোগ নিয়ে নিজকে প্রক্ষিপ্ত করিনে অপরের উপর।

কিন্তু, হায়, ইতিহাসে অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে শান্তিকামী জাতির উপর প্রতিবেশী, আগ্রাসী রাষ্ট্রের আক্রমণের। ভারতবর্ষ তার ভদ্রতাবোধ নিয়ে হিন্দ্-পাকিস্তান সীমান্তের সম্মান রক্ষা করলেও অপরপক্ষ আন্তর্জাতিক ভব্যতাকে উপেক্ষা করে উর্দিবিরহিত বাহিনী প্রেরণ করতে পারে কাশ্মীরে আর জয়সালমারে। আমার সহযাত্রীরা পারে আমার নৈঃশব্দ্যের নির্দেশ না মেনে আমার ব্যক্তিগতের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ

করতে। রাজধানীর 'অকাল গ্রীষ্ম' সম্বন্ধে কী যেন একটা রীতিমতো গরম আলোচনা যখন অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে তখন একজনের প্রয়োজন হোলো আমার সমর্থনের। আমার পিতৃব্যের বয়সী সেই ভদ্রলোক তাঁর গরম কোটটা খুলতে খুলতে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কী বলেন দাদা ?"

মসিঁয়ে টি্রগভে লী-র উদ্দেশ্যে মনে মনে বললেম, লিখে রাখো কোন পক্ষ থেকে প্রথম গুলীনিক্ষেপ হোলো।

একমাত্র নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্যতীত অন্য কারো মুখে এই 'দাদা' সম্বোধনটার বিরুদ্ধে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় বিদ্রোহ করে। এ আহ্বানে আন্তরিকতা নেই ; বহু-ব্যবহারের মালিন্যযুক্ত এই ডাকটায় আমি একটা অশোভনতার আভাস পাই। কেবলি ভয় হতে থাকে যে এর পরেই সুরু হবে অনাহূত আত্মীয়তা ; প্রশ্নধারা বর্ষিত হতে থাকবে নানা ব্যক্তিগত ব্যাপারে যার উত্তর দিতে অন্তরাত্মা আপত্তি করে, উত্তর না দিতে সৌজন্য। ফুটবল খেলায় যেমন অফসাইড্ আছে, একটা সময়ে প্রতিপক্ষ একটা সীমানার এপারে আসতে পারবে না, তেমনি সামাজিক জীবনে একটা আইনের প্রয়োজন আছে যা বাইরের লোককে বলবে ঃ এই পর্যন্ত, এর পরে আর নয়। খেলায় রেফারীর প্রহরিতা নিয়ম-ভঙ্গের প্রতিকার করে, কিন্তু রেলের কামরায় আমার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় নিজেকেই। হুইলারের স্টল থেকে ক্রীত বিদেশী সাময়িক পত্রগুলিকে বিস্তৃত করে দিলেম আমার মুখের সামনে।

চীনের দেয়াল চীনকে বিদেশী আক্রমণের হাত থেকে

বাঁচাতে পারেনি, মাজিনো লাইন পারেনি ফ্রান্সকে রক্ষা করতে। আমার পত্রব্যূহ ব্যবস্থাও তেমনি শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হোলো। পূর্ব-জিজ্ঞাসা উচ্চতর কণ্ঠে পুনর্ঘোষিত হোলো: "আপনি কোথায় যাচ্ছেন সার?" এবারে আর উত্তর না দিয়ে উপায় রইল না। বললেম, "দার্জিলিং"।

"দার্জিলিং ! ! !"

বিস্ময়বিস্ফারিত কণ্ঠে আমার গন্তব্যস্থলের নামটার এমন সম্মিলিত পুনরুচ্চারণ যেকোনো নাট্য-পরিচালকের শিক্ষার বস্তু হতে পারতো। আমার নিজের কৌতুকবোধ ব্যাহত হোলো সমগ্র সহযাত্রীকুলের এই সমবেত কৌতূহল প্রদর্শনে। এটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। এই জন্যই সকল প্রশ্ন এড়াতে চেষ্টা করেছিলেম প্রাণপণে। কিন্তু একবার যখন এদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি তখন জানি যে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি থেকে পরিত্রাণ নেই। এখন, ভাগ করে নিতে হবে সকলের সাথে আলাপন।

আমি আলাপবিলাসী। বিলাসী বলেই সকল আলাপেই আনন্দ পাইনে, কথা যে বলে তাকেই কথক বলে মনে করিনে। সঙ্গীত সম্বন্ধে দেখেছি, সাধারণত মানুষের একটা সংকোচ আছে। সে-বিদ্যায় যার পারদর্শিতা নেই, তার জন্যে সুরময় কণ্ঠ বিধাতা যাকে দেননি, সে স্নানের ঘরে বা কলকাতা বেতারের স্টুডিয়োর বাইরে বড়ো একটা গায় না। লোকেও তাকে গাইতে বলে না। কিন্তু কথার বেলায় সে-সংকোচের বালাই নেই, কথা বলতে পারাটায় যেন সকলের জন্মগত

অধিকার। অপ্রয়োজনীয় প্রগলভতাকে রসাল করতে যেন প্রয়োজন নেই সাধ্যের বা সাধনার। অন্তত আমার সহযাত্রীরা যে সকলেই সেই সহজ মতে বিশ্বাসী, শীঘ্রই তাতে আর সন্দেহ রইল না।

কে বলে বিস্ময়ে লোকে অবাক্ বা হতবাক্ হয়? আমার দার্জিলিং যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করে মুহূর্তকাল পূর্বে যে বিস্ময়ের সূচনা করেছিলেম তা নিয়ে তৎক্ষণাৎ যে বাগ্‌বিস্তার স্বরু হোলো তার কলরব নায়েগ্রার মতো অন্তত তিনটি জলপ্রপাতের কলোচ্ছ্বাস স্তব্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট। কোরাস ক্রমে সোলো-য় লঘুকৃত হলে শোনা গেল:

"বলেন কী মশাই? এই জানুয়ারীর শীতে দার্জিলিং? এখন তো বেলা বারোটায় বরফ পড়বে সেখানে! দার্জিলিঙের সীজন হচ্ছে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর। ১৯৩৭ সালে আমি যখন…"

জানতেম যে এর পরেই স্বুরু হবে বক্তার দার্জিলিং-বিজয়ের বিস্তৃত বিবরণী। সে কাহিনীতে উল্লেখ থাকবে প্রতিটি অপ্রাসঙ্গিক খুঁটিনাটির, তা সরকারী কর্মচারীর টুর ডায়েরির মতো বিশদ হবে এবং ঠিক তেমনি বিরক্তিদায়ক হবে। গল্প-বলার আর্টের প্রথম কথাটাই হচ্ছে কতটা বাদ দিতে হবে। ওরা যোগ জানে, বিয়োগ জানে না! তাই সে-বিবরণ নিবারণের উদ্দেশ্যে সময় থাকতে যোগ করলেম:

"দার্জিলিঙের সীজন আমার সীজন না হতে পারে।"

অপর এক ভদ্রলোক ঠিক এমনি কোনো স্বুযোগের জন্যে

অধীর ভাবে অপেক্ষা করছিলেন। কেন না, শীঘ্রই জানা গেল, তিনি নিজেও দার্জিলিং অভিমুখেই যাত্রা করেছেন। ভদ্রলোক সোৎসাহে আমার সমর্থনে ব্রতী হলেন।

"তা যা বলেছেন মশাই, কাজের কি আর সীজন আছে? ব্যবসার ডাক কি আসে কারো সুযোগ সুবিধে বিচার করে? এই দেখুন না, তিরিশ ওয়াগন্ টিম্বার আমার লোকেরা এত হ্যাঙ্গাম করে নামিয়ে এনে শিলিগুড়িতে জড়ো করেছে, কিন্তু সেই পর্যন্তই। তার পরে আর এগুতে পারছে না, এদিকে আমার ডেলিভারি ডেট এগিয়ে আসছে ভীষণ কাছে। হেঁ হেঁ," আপন পরিহাস-পটুতায় তুষ্ট হয়ে বলে চললেন, "হেঁ হেঁ, এখন আমার নিজের না গিয়ে উপায় আছে? বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন কিন্তু যার বাণিজ্যই দার্জিলিঙের পাহাড়ে তার উপায় কী না গিয়ে, তা মাসটা জানুয়ারীই হোক আর সেপ্টেম্বরই হোক!" একটু থেমে, "তা আপনারও তেমনি জরুরী কোন কাজ আছে বুঝি?"

ভদ্রলোকের সমর্থনে কৃতজ্ঞের চাইতে বিব্রত হলেম বেশি। তিনি নিজেও বোধ করি বিব্রত হলেন যখন বললেম, "আজ্ঞে না, আপনি যাকে লক্ষ্মী বললেন আমার তিনি কলকাতায়ই। তার হাত থেকে পলায়ন করতেই দার্জিলিং যাচ্ছি।"

এবারে তৃতীয় যাত্রীর সুযোগ সমুপস্থিত। তিনি টীকাকার মাত্র, বললেন, "অর্থাৎ ছুটিতে যাচ্ছেন?"

আমি শিরহেলনে সম্মতি জানাতেই পূর্বোল্লিখিত লক্ষ্মীর উপাসক আলোচনার সূত্র তুলে নিলেন নিজ হাতে।

"তাহোলে আমায় মাপ করতে হোলো মশাই। এই শীতে কেউ বেড়াতে যায় দার্জিলিঙের মতো বরফ-জমানো পাহাড়ে? আমার মটোই জীবনে এই যে কাজের জন্যে সব রকমের কষ্ট স্বীকার করতে রাজী আছি, কিন্তু তাই বলে অমনি নয়। রোজগারের জন্যে। হ্যাঁ, পেটে খেলে পিঠে সয়। হেঁ হেঁ, আমার ব্যবসার স্থুরু হয়েছিল খুব ছোটো ভাবেই। শুধু এই ছু'টো হাতের পরিশ্রমের জোরেই না আজ ছু'টো পয়সা নাড়াচাড়া করতে পারি। দার্জিলিং তো দার্জিলিং, দরকার হলে, লাভের আশা থাকলে, তিব্বত-সিকিম যেতে রাজী আছি।..."

সেই উদ্যোগী পুরুষসিংহ অনতিবিলম্বেই নিজেকে সমগ্র পুরুষ জাতির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ করলেন যে, সে-জাতির একমাত্র ধর্ম হচ্ছে অর্থকরী কর্মে পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ। সমগ্র মানব জাতির জীবন-দর্শন সম্বন্ধে তাঁর আপোষ-বিহীন, সুস্পষ্ট মতামতের সবিস্তার বিশ্লেষণ অপর সকল যাত্রীর সাগ্রহ সমর্থন লাভ করল। গর্বিত নায়ক এবারে পরম করুণাভরে পরাজিত শত্রুকে নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের সর্বশেষ সুযোগ দান করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আচ্ছা, এই যে সকল প্রকার বিপদ বাধার সম্মুখীন হয়ে, সব বিপত্তি অগ্রাহ্য করে সোনার খনি আবিষ্কার করা, এইটেই কি পুরুষচরিত্রের সব চেয়ে বেশি মূল্যবান গুণ নয়?"

"না, মানুষের সব চেয়ে কাম্য গুণ হচ্ছে স্বল্পভাষিতা।"

আমার এই সংক্ষিপ্ত উত্তর যে উপস্থিত যাত্রীমণ্ডলীর তীব্র ক্ষিপ্ততার কারণ হবে, সে আশংকা স্মরণ করে আর বাক্যব্যয়

না করে আপাদ-মস্তক কম্বলে আচ্ছাদিত হয়ে ক্লান্ত শরীর প্রসারিত করে দিলেম আমার নির্ধারিত বার্থের উপর। আমার উদ্ধত উক্তিটা ছিল বিলম্বিত-বিস্ফারী বোমার মতো। তার পূর্ণ মর্মোদ্ধার করে প্রতিপক্ষ যখন প্রতিক্রিয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন, আমার নিদ্রার ভাণ তখন বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। শুনতে পেলেম ঃ

"লোকটা ভদ্রতা জানে না!"

"উহুঁ, এই শীতে যখন বেড়াতে দার্জিলিং যাচ্ছে তখন আমার কী মনে হয় জানেন," গলার স্বরটা আরো একটু ক্ষীণ হোলো, "আমার মনে হয় মাথার একটু দোষ আছে!"

আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা যে বেশ গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এর পূর্বেও সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। শীতলতম শৈলাবাসে বিশ্রাম মানসে যাওয়ার অনুকূল ঋতু যে শীত নয় সে সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিল সবাই। ম্লেচ্ছ মনিব বলেছিল, "এখন ভীষণ শীত যে দার্জিলিঙে!" দ্রাবিড় সহকর্মী বলেছিল, "Have you gone bats or what?" অভিজ্ঞ বান্ধব বলেছিল, "এ জার্নি 'বোনা ফাইডি' হতেই পারে না। কিছু একটা আছে তোমার আস্তিনের তলায়।" স্নেহশীলা ভগিনীর নিষেধ অমান্য করায় শুনতে হয়েছিল, "শেষে নিউমোনিয়া নিয়ে এসে মাকে ভোগাবে আর কি!"

বারণ করেনি শুধু একজন, যার মৃদুতম অননুমোদনের সামান্যতম ইঙ্গিতের ক্ষীণতম আভাসের জন্যে রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করেছিলেম গাড়ি ছাড়বার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত।

দুই

চিত্রের পরিপূর্ণ প্রস্ফুটনের জন্যে চাই বিস্তীর্ণ পটভূমিকা, প্রতিমাকে মূর্ত করে তোলে তার পশ্চাতের বিশাল চাল। মানব-জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে তেমনি প্রয়োজন আছে একটা মহৎ পরিবেশের। এই পরিবেশের প্রকৃতির প্রকারভেদ যে মানব-চরিত্রকে বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এ-কথাটা বোধহয় সাধারণত আমরা উপলব্ধি করিনে যে, পরিবেশের আকৃতিটাও প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ। সংকীর্ণ পরিবেশে ব্যক্তিত্ব থাকে সংকুচিত হয়ে। যেখানে সবাই পরিচিত, সব কিছু জানা, জিজ্ঞাসা সেখানে সুপ্ত। জড়-পদার্থের জন্যে আঁট, মাপসই কোনো আধারই যথেষ্ট—তলোয়ারের খাপ যেমন তলোয়ারের মাপ মেনে চলে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথেরই উপমা, সাড়ে তিন হাত মানুষ যদি সাড়ে তিন হাত উঁচু ঘরে বাস করে তবে তার বৃদ্ধি খর্ব হয়, বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়।

মধ্যবিত্ত জীবনের অভিশাপ নিয়ে যত সাহিত্যিক ও রাজনীতিক অশ্রুবিসর্জন হয়েছে তার অধিকাংশই তার বিত্তের মধ্যতাকে কেন্দ্র করে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে সে-জীবনের নিষ্ঠুরতম অভিশাপ হচ্ছে পরিবেশের সংকীর্ণতা, সঙ্গতির সামান্যতা নয়। নানা তুচ্ছ প্রয়োজনের প্রাচীর দিয়ে

ঘেরা সেই মধ্যবিত্তের ক্ষুদ্র বিশ্বে বৃহৎ কিছুর স্থান নেই। প্রস্থে তা পর্যাপ্তপ্রায়, উচ্চতায় সাড়ে তিন হাত। সেখানে নেই আকাশের নিঃসীম উদারতা। প্রাসাদের কৃত্রিম বিশালতাও নেই মধ্যবিত্তের সেই ভাড়াটে ফ্ল্যাট বাড়িতে।

একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে যে, পটভূমির আকৃতির বিরাটত্বের যে-কথা আমি বলেছি তা কেবল মাত্র অর্থলভ্য নয়। চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল, সে আছে মাটির কাছাকাছি। তার পরিবেশের পরিধি দিগন্ত-বিস্তৃত। সে বাস করে তার জীর্ণ কুটীরে। সে-কুটীর এতই জীর্ণ যে অধিকাংশ সময়েই তার মাথার উপরকার ছাদ তার গৃহের চাল নয়, আকাশ। রৌদ্রের আশীর্বাদ তাকে আবৃত করে রাখে সারা দিনমান, রাত্রি অবতীর্ণ হলে তার পারিপার্শ্বিকের গভীর অন্ধকার লাঞ্ছিত হয় না মানবোদ্ভাবিত নানা কৃত্রিম আলোর নির্লজ্জতায়। প্রকৃতির সন্তান সে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। এই অস্তিত্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে সে প্রকৃতির হস্তে স্বেচ্ছা-ক্রীড়নক।

প্রকৃতির করুণা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় না। তাই নিয়ে মৃত্তিকার সন্তানের অভিমান আছে, কিন্তু অভিযোগ নেই। তার প্রশান্তি প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণে। বৃহতী প্রকৃতির প্রশস্ত ক্রোড়ে সে তার আপন অসহায় ক্ষুদ্রতা নিয়ে তুষ্ট, শিশু যেমন মায়ের কোলে।

অপর দিকে ধনশালী শিল্পপতি তাঁর আনন্দ আহরণ করেন প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করে নয়, তাকে জয় করে। গভীর

অরণ্য তাঁর কাছে রহস্যময় একটা অজ্ঞেয় বিস্ময় নয়, প্রভূত অর্থাগমের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ধ্বংসাপেক্ষী একটা ক্ষেত্র মাত্র। পর্বতগাত্র-প্রবাহিনী নির্ঝরিণীর নিরাপদ দূরত্বে দণ্ডায়মান শিল্প-পতির কর্ণে আর যে চিরন্তনী বাণীই বর্ষিত হোক না কেন, এ-কথা নিশ্চয়ই তাঁর নিমেষের জন্যেও মনে আসে না যে তা "ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে।" যদিও এমন সম্ভাবনা আদৌ কল্পনাতীত নয় যে তিনি "পদে পদে তব আলোর ঝলকে" স্মরণ করে অযথা কালহরণ না করে অনতিবিলম্বেই একটি হাইড্রো-ইলেকট্রিসিটির যৌথ ব্যবসায়ের উদ্যোগ করবেন। অর্ধ-সভ্য আদিবাসীরা তাতে বর্বরতার ঘনান্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে যন্ত্র-সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু কিছুতেই এটাকে অবিমিশ্র আশীর্বাদ বলে মনে করতে পারিনে। কেবলি সন্দেহ জাগে, মানব-দেহের সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে মানব-মনকে বড়ো কঠোর মূল্য দিতে হয়নি কি?

আকাশের আকর্ষণ তার অসীমতায়, ইন্দ্রধনুর বিহ্বলতা তার অনির্দেশ্যতায়, নক্ষত্রমণ্ডলের সৌন্দর্য তার অসংখ্যতায়। তেমনি স্পর্শাতীত, সংজ্ঞাতীত, এমন কি বোধাতীত কিছু একটার প্রয়োজন আছে মানব জীবনে। সমুদ্রের অতলতা ও অনতিক্রমণীয়তায় নিরাপত্তা নেই। বরং মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে প্রতি তরঙ্গের ভয়াবহ ব্যাদানে, হাঙর-কুমীরের চিরক্ষুধিত উদরে আছে মরণের আমন্ত্রণ। কিন্তু তবু, সেই সমুদ্রের সঙ্গীতেই আছে দুর্জয় জীবনের সুস্পষ্ট জয়গান। কূপে শুধু

আছে মণ্ডুকের স্তিমিত অস্তিত্বের ঘৃণিত ধ্বনি। সমুদ্রে আছে নাবিকের নির্ভয়তা, আছে নুলিয়ার পরিপূর্ণ ভাগ্যনির্ভরতা। ভিন্নমুখী হলেও, উভয়ই কল্পনাকে জাগ্রত করে। কিন্তু কূপ নিয়ে কোনো মহাকাব্য রচিত হবে, এমন সম্ভাবনাও কল্পনা করতে পারিনে।

আজন্ম কূপবাসী হচ্ছে মধ্যবিত্ত। তাকে নিয়ে মহাকাব্য হয়নি, হবে না। তার আত্মজীবনীর নাম 'আত্ম-জীবিকা' হলেই সমীচীন হয়, কেন না, সাধারণত তার জীবিকা গ্রাস করে থাকে তার জীবনকে। সে নিশ্বাস নেয় তার আপিসের সীলিং ফ্যানের কৃত্রিম হাওয়ায়! সে-হাওয়া বয়ে আনে না কোনো অজানা দেশের অশ্রুত বাণী। তাই 'শুধু প্রাণধারণের, শুধু দিন-যাপনের' সেই গ্লানিতে 'জীবন যখন শুকায়ে যায়, সকল মাধুরী লুকায়ে যায়' তখন অ্যান্নুয়েল লীভ আমার জন্য বয়ে আনে, অবসাদ নয়, শুধু মাত্র অবসরও নয়; বয়ে আনে অনির্বচনীয় এক আশীর্বাদ। তখন আমার আঁখির তারায় যেন গান গায় অরণ্য পর্বত। টেবিলের পায়ায় বাঁধা পা-দু'টো তখন পাগল হয় দূরের আহ্বানে।

পাক্‌শী বা জশিডিতে যাঁরা ছুটি কাটান, তাঁদের সাবধানী প্রকৃতির প্রশংসা করব দূর থেকে। কিন্তু তাঁদের ঈর্ষা করিনে। আমি অমন ছুটিকে ছুটি বলেই মানিনে। এ যেন বাড়ির বারান্দায় প্রাতর্ভ্রমণ বা চৌবাচ্চায় সন্তরণ। শিমুলতলা আর কার্মাটোর তেমনি বাড়িরই একটু প্রসরণ মাত্র; তাতে অজানার সঙ্গে পরিচয়ের সম্ভাবনা তো নেই-ই; এমন কি, অতি-পরিচিতের হাত থেকেও পরিত্রাণ নেই।

আমার সঙ্গে তাঁদের প্রভেদটাই অবশ্য মূলগত, কেন না আমি বাইরে যাই স্বাস্থ্যের অন্বেষণে নয়, বাইরের অন্বেষণে ক্লান্ত শরীরটাকে মেরামত করতে নয়, জীর্ণবাস পরিত্যাগ করতে; হাওয়া বদলাতে নয়, মন বদলাতে। স্থানান্তরে আমি জন্মান্তর খুঁজি।

সে জন্যে দূরত্বটা একান্তই আবশ্যক। ওরা বলে, সান্নিধ্য ঘৃণা আনে। এটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যুক্তি হতে পারে। কিন্তু যা দূরের, যা অজানা, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যা কেবলি চাইতে হয় কিন্তু কখনোই পাওয়া যায় না, তার সম্পূর্ণ বিভিন্ন একটা আকর্ষণ আছে। সেই অজ্ঞেয় অস্তিত্ব অস্বীকার করেন বিজ্ঞান-বিশ্বাসী আধুনিক। তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারেন স্থূলানুভব বিষয়ী। প্রথমের ঔদ্ধত্য আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়, দ্বিতীয়ের স্থূলতা বিরক্তি।

পৃথিবী নামক এই যে গ্রহটায় আমি নামক এই যে সপ্রাণ বস্তুটি প্রক্ষিপ্ত হয়েছি, এই সমন্বয়টার পরিপূর্ণ একটা ব্যাখ্যার সন্ধান করে ফেরে আমার মন। বিজ্ঞানীর বস্তু-সর্বস্ব ব্যাখ্যা-টাকে কিছুতেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারিনে। সে ব্যাখ্যার কোথায় যেন ফাঁক আছে, আছে ফাঁকি। কিছুতেই মেনে নিতে পারিনে যে জীবন হচ্ছে অসম্বদ্ধ কতকগুলি আক-স্মিকতার সমষ্টি মাত্র। হৃদয় কিছুতেই এই নৈরাশ্যপূর্ণ ধারণাটা গ্রহণ করতে চায় না। সমস্ত অন্তরাত্মা এই অবিশ্বাস-টাকে প্রত্যাখ্যান করে যে জীবনটা কোনো মূঢ়কথিত প্রলাপ মাত্র।

অথচ প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা প্রতিবাদ করে সেই নির্বিচার বিশ্বাস্‌টার বিরুদ্ধেও, যা বিশ্বের সব-কিছুকে ঈশ্বরের নিখুঁত একটি কাব্যসৃষ্টিরূপে জ্ঞান করে। জীবনের প্রতি পদে সেই কাব্যের ছন্দঃপতন প্রত্যক্ষ না করে উপায় নেই। 'রাইম' তো দূরের কথা, অসংখ্য ক্ষেত্রে ঘটনার 'রীজন' আবিষ্কার করতে গিয়েও হাল ছেড়ে দিতে হয়। ঈশ্বরের পরম করুণাময়তার সঙ্গে কিছুতেই সামঞ্জস্য বিধান করতে পারিনে অসহায়া বিধবার একমাত্র পুত্রের মোটর-দুর্ঘটনায় মৃত্যুর, প্রমাণিত দুর্বৃত্তের উত্তরোত্তর ক্ষমতাবৃদ্ধির, এবং এমনি আরো সহস্র নিত্যপ্রত্যক্ষ ঘটনার। 'রচনার সামঞ্জস্য পদে পদে রয়েছে খণ্ডিতে।' তা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী অর্কেস্ট্রার যে ঐক্যতান বিশ্বকবি শুনেছেন, তা শোনবার কান বিধাতা আমায় দেননি। আমার শ্রবণে সে হার্মনি খণ্ডিতলয়। আমি তাই যে নদী মরুপথে হারালো ধারা আর যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে, তাদের উপর পূর্ণের পদপরশ আবিষ্কার করতে না পেরে অস্থির হই। প্রশ্ন করি, উত্তর পাইনে।

আমার পিতামহ এই ব্যাধি থেকে একেবারেই মুক্ত ছিলেন। তিনি যেমন নিযুক্ত হয়েছেন, তেমন করেছেন। তাঁর হৃদিতে হৃষীকেশের আসন ছিল দৃঢ়। তিনি ঈশ্বর নামক কুম্ভকারের হস্তে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন মৃত্তিকারূপে। তার চরম পরিণতি প্রদীপ হবে না ফুলদানি হবে, তা নির্ধারিত হবে কুম্ভ-কারেরই নির্দেশে। আগে থেকে তা জানতে চাইবার তাঁর না ছিল অধিকার, না ছিল দরকার। তিনি তো নিমিত্ত মাত্র। তাঁর বেলায়

'সুধা দিয়ে মাতান যখন' তখন যেমন ধন্য হরি, ধন্য হরি ; তেমনি 'ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন' তখনও ধন্য হরি, ধন্য হরি।

প্রথম তারুণ্যে এই আপাত-বিরোধিতায় হেসে আকুল হতেম। সমানুভাবী বন্ধুজনের সপ্রশংস উপরোধে প্যারডি করে বলতেম, গয়লা দুধ দিলেও দাম দেব, দুধ না দিলেও দাম দেব। আজ লজ্জিত হই সে হাসির কথা স্মরণ করে। আজ জানি, মাঝে মাঝে অন্তরের অন্তস্তলে উপলব্ধি করি, যে আমার পিতামহের সেই প্রশ্নহীন বিশ্বাসের মধ্যে এমন কোন অন্তহীন প্রশান্তি নিহিত ছিল যার সন্ধান পেলে আমার আজকের অশান্ত জীবনকে হয়তো সহনীয় করে তুলতে পারতেম !

তখন ভাবতেম আমার বিশ্বাসী, বৃদ্ধ, বিগততেজ পিতামহ বুঝি প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। আজ আর সেই অর্বাচীনতার নিশ্চয়তা নেই ! আজ জানি যে, হয়তো তিনি সত্যিই তাঁর প্রশ্নের চরম উত্তর পেয়েছিলেন। সে-উত্তরের সত্যতা বুদ্ধি তার আপন ঔদ্ধত্যে প্রত্যাখ্যান করলেও হৃদয় জানে সত্য বলে।

তখন ভাবতেম ইহলোক থেকে বিদায় নেবার আগে বৃদ্ধ বুঝি কল্পিত পরলোকের ভয়াল কর্তার সঙ্গে সন্ধি করে নিতে চাইছেন। আজ যখন পদে পদে আপন বিবেকের সঙ্গে সন্ধি করে ইহলোকের অস্তিত্ব বজায় রাখতে আপনাকে প্রায় বিকিয়ে দিয়েছি, তখন অশীতিপর বৃদ্ধকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ না করে পারিনে। তিনি পরলোকের সঙ্গে সন্ধিভিক্ষা করে-ছিলেন কি না জানিনে—আপন বিবেকের সঙ্গে কখনোই করেননি। করেননি আপন বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।

আজকের পরিতৃপ্ত আমি পিতামহের সেই স্থির বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি কই? বিশ্বাস জিনিসটাই এমনি, সে যায় অতি সহজে কিন্তু একবার গেলে আর ফিরে আসতে চায় না কিছুতেই। তখন বিশ্বাসের বস্তুকে স্বহস্তে নিষ্পেষিত না করে থামবার উপায় নেই, ওথেলো যেমন থামতে পারেনি ডেসডিমোনাকে বালিশের তলায় না পিষে। আজকের আমাদের প্রত্যেকের ছুর্বুদ্ধি-বালিশের তলায় সমাধিস্থ আছেন এক-এক জন অবিশ্বসিত ভগবান। আধুনিক কাব্যে তাই মনুষ্য বণিত হয়েছে শূন্য মানুষ, ফাঁকা মানুষ, ফাঁপা মানুষ বলে।

আমার পাশ্চাত্য সতীর্থের বেলায় তবু সেই শূন্যতার অন্তত সাময়িক পূরণ হয়েছে। সে মন্ত্রদেবকে নিধন করে যন্ত্রদেবকে সিংহাসনে বসিয়ে পূজো করছে ভক্তিভরে, শক্তিভরে। আত্ম-গরিমায় গাঁথা সেই পশ্চিমী ইমারতে যে জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরেছে তার কিঞ্চিদধিক আভাস পাওয়া যাচ্ছে তার অধুনাতন সাহিত্যে, সমাজের ভাঙনে, জীবন-যাত্রার পলায়নী উদ্দামতায়। কিন্তু তা এখনো একেবারে ধ্বসে যায়নি।

এদিকে আমার অবস্থাটা একেবারেই মর্মান্তিক। আমি ভগবদ্-বিশ্বাসের তরী থেকে ঝাঁপ দিয়েছি, কিন্তু অবিশ্বাসের তীরে যাওয়ার সাধ্যও নেই, সাধও নেই। তাই শূন্য মন্দির মোর। আমি বারাণসী পরিভ্রমণ করে এসে সেই তীর্থের অস্বাস্থ্য-করতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে জ্বালাময়ী প্রবন্ধ রচনা করি। আমি অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির পরিদর্শন করতে গিয়ে তার স্থাপত্য

পর্যবেক্ষণ করি, আলোচনা করি সে·মন্দিরের দর্শনাভিলাষীদের পাদুকা-রক্ষণ-ব্যবস্থা নিয়ে। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেও এক মুহূর্তের জন্যেও অন্তরে সেই অনির্বচনীয় অনুভূতির পরশ পাইনে যা অঙ্গে আমার, চিত্তে আমার মুক্তি দিতো আনি। আমি শুধু আমার আপিসের টেবিলের সঙ্গে বাঁধা নেই, বাঁধা আমার সর্বনাশা অবিশ্বাসের সঙ্গে।

উত্তম পুরুষের অতি-উল্লেখ করেছি এই জন্যে যে উপরের এলোমেলো চিন্তাগুলো আমারই নিদ্রাহীনতার সন্তান। আপন গৃহের কোমল শয্যায়ই নিদ্রা আমার অত্যন্ত অল্প, তার উপর দ্রুত ধাবমান গাড়ির গর্জনের সঙ্গে সহযাত্রীর নাসিকা-গর্জন সম্মিলিত হয়ে আক্রমণ করলে নিদ্রা আমার একেবারেই নির্বাসিত হয়। সহযাত্রীদের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখলেম তাঁরা সবাই ঘুমে অচেতন। আরেক বার নির্মমভাবে নিজেকে বড়ো একা মনে হোলো!

কিন্তু, যদিও অগৌরবে এক বচন ব্যবহার করেছি এতক্ষণ পর্যন্ত, আমার অবিশ্বাসের, আমার অনিশ্চয়তার, আমার জীবনের অধ্রুবতার সমস্যা বোধ হয় একমাত্র আমার নয়। বর্তমান শতকের বহু সহস্র ভারতীয় নিশ্চয়ই, জ্ঞাত ভাবে বা অজ্ঞাতসারে, ঠিক এই সমস্যারই সম্মুখীন। জীবন আমাদের সামনে সংগ্রামের নির্দয়তা ও ভয়াবহতা নিয়ে দেখা দিয়েছে, কিন্তু সে যুদ্ধে লড়াই করব কোন উদ্দেশ্যের নির্দেশে? কোন আদর্শের প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হবো? প্রাণ দেবো কোন পতাকার মান রাখতে? বাঁচা আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে

এই জন্যে যে মরবার মতো কোনো মহৎ কারণ নেই আমাদের চোখের সামনে। বাঁচা আমাদের না-বাঁচার 'অলটারনেটিভ' মাত্র, মরা শুধু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। এ দু'টো চরমের মাঝখানে না আছে বৃহৎ কোনো জয়, না আছে মহৎ কোনো পরাজয়। শুধু প্রাণধারণের, শুধু দিনযাপনের গ্লানি!

সামাজিক সোপান-ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের অবস্থিতিটা অবিমিশ্র অগৌরবের। নীচের তলায় কৃষক-শ্রমিক মার্ক্স-মন্ত্র পান করে তাদের অসামান্য গঠন-শক্তির অপরিমেয় সম্ভাবনার দম্ভে স্ফীত! তার সামনে আছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। উপরের তলার ধনিকের আছে অতীত, তার গর্ব আজো উষ্ণ। কিন্তু মধ্যবিত্তের আছে কী? তার অতীতও নেই, ভবিষ্যৎও নেই। মানুষের সমাজে সে আরো কিছুদিন হয়তো বাঁচতে পারে, কিন্তু মানুষ হয়ে নয়! শ্রমিকের অরিজন হয়ে, নয়তো ধনিকের হরিজন হয়ে।

কিন্তু আমার এই অন্যথা-ব্যর্থ জীবনের অস্পষ্ট যেন একটা অর্থ খুঁজে পাই প্রকৃতির পারে এসে। আমার আত্মার কী যেন আত্মীয়তা আছে অনাদি কাল থেকে ওই অরণ্যের সঙ্গে। অলঙ্ঘ্য ওই পর্বতের ওপারে বুঝি আছে আমারই অতীতের কোন একটা বিস্মৃত অংশ। প্রকৃতির সান্নিধ্যে আবার যেন ফিরে পাই নিজেকে, আবার যেন পরশ পাই স্পর্শাতীতের, আবার যেন বোধকরি যে সূর্যের তলায় আমারও একটা স্থান আছে, আবার যেন অনুভব করি সেই অদৃশ্য শক্তিকে যার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারিনে কিন্তু অস্বীকারও করতেপারিনে।

পূর্বে যে পটভূমির, যে বৃহৎ পরিবেশের কথা বলেছি,—যা না থাকলে জীবন হয় ডাঙায় তোলা নৌকার মতো বিফল বা জলে-পড়া মোটরগাড়ির মতো বিকল—সেই পরিবেশ, সেই পট ভূমি দিতে পারে গভীর বিশ্বাস, 'ফেইথ'। আর সেই গভীর বিশ্বাসের একমাত্র 'সবস্টিট্যুট' হতে পারে 'নেচার', প্রকৃতি। প্রকৃতিতে প্রতিকৃতি আছে সেই "হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে"র, সেই অন্যতর জগতের, সেই লোকাতীত লোকের যার অদৃশ্য অস্তিত্বের নিঃসন্দেহ আভাস মেলে সঙ্গীতের অদেহী মূর্ছনায়, কাব্যের অস্পষ্টতায়।

সেই অন্যতর জগতের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেয়ে যাঁরা ক্ষান্ত হবেন না তাঁদের উপহাস আজ উপেক্ষা করতে পারি। 'সমস্ত কে জেনেছে কখন?'

অনুভূতি প্রমাণ করতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। সঙ্গীতের আবেদন শ্রবণের কাছে ; যে সেই আবেদনে সন্তুষ্ট না হয়ে বলবে, 'কই কিছু দেখতে পেলেম না তো!' তার কাছে সঙ্গীতের অস্তিত্ব প্রমাণ করব কী করে? ফুলের সৌরভ আছে কি নেই তার প্রমাণ ঘ্রাণেই। কিন্তু যে রসনার পরীক্ষা ছাড়া কোনো কিছুকেই পাশ মার্কা দেবে না, তার কাছে ফুল তো অখাদ্য শাক হবেই। অমন প্রমাণে আমার প্রয়োজন নেই।

যাকে বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় তাকে বুদ্ধি দিয়েই জানা ভালো। আর, যাকে জানতে হয় হৃদয় দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে, তাকে তাই দিয়েই জানতে হয়। তা নইলে জানাই হয় না।

শীতের শিলিগুড়ির জনবিরল স্টেশনে নেমেই দূরে তাকিয়ে

দেখলেম, তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা উজ্জ্বল হয়ে আছে নবোদিত সূর্যের স্বর্ণাভ কিরণ-মহিমায়। একবারও মনে হোলো না যে চিরপরিচিত কলকাতাকে ফেলে এসেছি পশ্চাতে। মনে হোলো যেন বহু দিনের বিদেশ-বাসের পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করছি। যদিও এই আমার প্রথম হিমালয় দর্শন। দেশের ঘাটে এসে পৌঁছেছি, বাড়ি পৌঁছতে আর কতক্ষণ!

হিমালয়, তোমাকে নমস্কার করি। তোমার ওই অভ্রভেদী তুষারকিরীট গিরিশৃঙ্গের শীর্ষ স্পর্শ করতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে বহুদূরাগত শত সহস্র উদ্ধত পর্যটক। আমি তো তোমাকে জয় করতে আসিনি, এসেছি তোমার পায়ে পরাজয় স্বীকার করতে। শীর্ষদর্শনের দর্প নিয়ে ফিরে যাওয়ার সামান্যতম অভিলাষ আমার নেই, আমি তো এসেছি শুধু সকল দর্প সমর্পণ করতে তোমার পদতলে।

শিলিগুড়ির হাওয়ায় দার্জিলিঙের আমেজ আছে। তারই মধ্যে আমি চিনলেম আমার দার্জিলিংকে। এখানে এসেই শুনলেম সেই অপর লোকের বাঁশি! কাজ নেই আমার বাঁশুরিয়ার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণে। চাইনে আমি তার দৈর্ঘ্যের পরিমাপ আর গাত্রবর্ণের বিশদ বিবরণী। বাঁশী যে শুনেছি, সেটা মিথ্যা হতে পারে না! 'সে কথা কভু আর পারে না ঘুচিতে'—আর কেউ না শুনলেও।

তিন

ঘুমের দেশে ভাঙ্গিল ঘুম। কিন্তু ঠিক কলস্বর উত্থিত হোলো না। সদ্যসুপ্তোত্থিতের জড়িমা ছিল ঘুম বাজারকে আচ্ছন্ন করে। স্বল্পসংখ্যক দোকানে ক্রেতার সংখ্যা ছিল স্বল্পতর। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অবশ্য প্রয়োজনীয় কয়েকটা পণ্য ব্যতীত অন্য বিশেষ কিছু দৃষ্টিগোচর হোলো না। অর্ধমুদিত নয়নে মুদি বসে আছে ওই কোণের দোকানটায়। নানাবিধ শীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত নিশ্চল, নিথর সেই মুদিকে ধ্যানমগ্ন মুনি বলেই ভুল হয়। আর চতুষ্পার্শের চালডালের স্তূপ যেন কতিপয় উপদিকাদ্রি—ঘিরে আছে নব-বাল্মীকিকে, যে রামায়ণ ভাববে কিন্তু লিখে উঠতে পারবে না। ক্রেতার অনাগমনে তার অচলা অনাসক্তি, আগমনই বোধ করি বিরক্তির কারণ হবে! প্রত্যেকটি দোকানীর স্বার্থলেশশূন্য অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে এমন একটা নির্লিপ্ত নির্লোভ বৈরাগ্য স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ ছিল যে ক্রয়েচ্ছুর তুচ্ছ প্রয়োজনের গন্ধময় বার্তা নিয়ে তাদের ধ্যানভঙ্গ করার কথা চিন্তা করা যেন চিন্তাহীনতারই নামান্তর।

আমার সহযাত্রীরা প্রাতরাশের প্রয়োজনে গাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলেন কেল্‌নারের সন্ধানে। অদূরেই সেই পান্থ-পেয়াবাসে চায়ের আয়োজন ছিল। আমারও প্রয়োজন ছিল

সেই পানায়ের। হাতে সময়ও ছিল, কেন না ড্রাইভার জানিয়ে গিয়েছিল যে গাড়িটার কিঞ্চিৎ মেরামত চাই। তবু উঠিনি। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মতো নিরীক্ষণ করছিলেম ধ্যানস্তব্ধ দোকানীদের তাপস রূপ আর অনুভব করছিলেম চারি দিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন।

অথচ এটা বাজার মাত্র। ইংরেজীতে যাকে বলে জান্তব প্রয়োজন, তারই দাবী মেটাতে এখানে ক্রেতা-বিক্রেতার মিলন। কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না এই রূঢ় সত্যটা।

আমি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী নই—প্রথমে আমার অনুরাগ অনেক ক্ষেত্রেই অপর পক্ষের আহ্বানের অপেক্ষা রাখেনি! কিন্তু দ্বিতীয়ে আমার আসক্তি অবিশ্বাস্য রকম পরিমিত। শয্যাতলে কাঞ্চনের অবস্থিতি পরমহংসদেবের মতো আমার দেহে উত্তাপের সঞ্চার করে না কিন্তু অর্থকে নেসসরি ঈভ্‌ল বলেই মনে করি। তাই ঘুম বাজারের পরিব্যাপ্ত অপার্থিবতার মধ্যে এ-কথা মনে করতে অত্যন্ত খারাপ লাগছিল যে এখানেও সব-কিছু ক্রয় করতে হয় মুদ্রারই বিনিময়ে। আমি অর্থনীতিবিশারদ নই, কিন্তু কেবলি মনে হচ্ছিল যে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতর স্থানে যা খুশি হোক, এইখানে বার্টার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন হলেই যেন সুসমঞ্জস হয়। এখানে অন্তত দেবে আর নেবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে। এই ক্ষুদেমানবের সাগরতীরে সেইটেই যেন শোভন হোতো।

সামাজিক পরিভাষায় যাকে সক্‌সেস্‌ফুল বা সফল বলে আমি

তা নই। সেই সাফল্যদ্রাক্ষা আমার একেবারে আয়ত্তাতীত ছিল না। আমি পূরোপূরি সেই ঈশপ-উপকথার আশাহত শৃগাল নই। তবু যে আমি সফলসঙ্গ সযত্নে পরিহার করি তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা আমার ব্যর্থতায় নেই। আছে আমার চরিত্রে। সহযাত্রী উদ্যোগী পুরুষসিংহ তাই আমার হৃদয়ে ঈর্ষা বা সৌহার্দ্যের উদ্রেক করেননি, বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার কারণ হয়েছেন। তখনো জানতেম না যে আমার জন্যে অভাবনীয় বিস্ময়ও সঞ্চিত ছিল।

সহসা সহযাত্রী তাঁর ফ্লাস্ক থেকে গরম চা পরিবেশন করতে করতে বললেন, "খাবার বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু ওদের চা-টা যে ভালো একথা স্বীকার করতেই হবে। আপনি যা অদ্ভুত লোক, তেষ্টা আছে অথচ তা মেটাবার চেষ্টা নেই। এতবার বললুম তবু সেই গাড়ি ছেড়ে উঠলেন না তো উঠলেনই না। কী আর করব? আমিই ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এলুম আপনার জন্যে। যাই বলুন মশাই, আপনার মতো লোকদের একা চলাফেরা করা উচিত নয়। তার যোগ্যতা নেই আপনাদের। তা আপনি আমার উপর রাগ করুন আর যাই করুন, সত্যি কথা বলবই।"

এতটুকু রাগ করিনি। আমার স্বপ্নভঙ্গে খুশি হইনি। সহযাত্রীর কল্পনাবিরহিত স্থূলতায় বিরক্ত হয়েছি, কিন্তু তার চাইতেও বেশি বিস্মিত হয়েছি তাঁর অযাচিত সহৃদয়তায়। লজ্জিত বোধ করলেম এই জন্যে যে, এই সহৃদয়তা ছিল আমার দিক থেকে একেবারেই অনর্জিত। ট্রেনে আমি তাঁর প্রশ্নের

যে একশব্দসর্ব্বস্ব উত্তর দিয়েছিলেম তার অসামাজিক রূঢ়তা আমি নিজেও অস্বীকার করতে পারব না। শিলিগুড়ি থেকে ঘুম পর্যন্ত একবারও তাঁর সঙ্গে বাক্যবিনিময়ের প্রয়োজন বোধ করিনি, যদিও গাড়িতে বসেছিলেম একেবারেই পাশাপাশি। বরং তাঁর বহু প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাখ্যান করেছি অশ্রবণের অভদ্র অজুহাতে।

এখন তাঁরই কাছ থেকে বন্ধুত্ব গ্রহণ করতে সংকোচের আর সীমা রইল না। কৃতজ্ঞতা পাছে প্রকাশে কৃত্রিম হয়ে পড়ে, পেয়ালা মুখে তুলবার অজুহাতে হাত দুটো তুলে নমস্কার জানালেম ভদ্রলোককে। সেই সঙ্গে স্মরণ করলেম আরো বহু জনকে, সখ্যতায় আমার আপাত অনীহা সত্ত্বেও যাঁরা আন্তরিক সৌহার্দ্য দান করেছেন অকৃপণ ভাবে। সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ পোষণ করে মনকে যখন বিষাক্ত তিক্ততায় ভরে তুলি এবং স্বরচিত নিঃসঙ্গতার নির্মোক পরিধান করে সকল সান্নিধ্য পরিহার করি, তখন এমনি অপ্রত্যাশিত দাক্ষিণ্য রুদ্ধকক্ষে দক্ষিণ সমীরণের মতো ভেসে এসে স্মরণ করিয়ে দেয় যে পৃথিবীকে 'দিয়েছি যত, নিয়েছি তার বেশি'। অনেক, অনেক বেশি।

আমার সহাস্য নমস্কারে উৎসাহিত হয়ে সহযাত্রী তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করলেন, "জানেন, আসবার পথে ওই যে মাইলের পর মাইল বন-জঙ্গল দেখলেন না? ওই হচ্ছে সুক্‌না ফরেস্ট্রি। এ দেশের ব্যবসাই দু'টো, চা আর কাঠ। দু'টোই পরের হাতে, সরকারের বা বিদেশীর। তাছাড়া

ছোটো-খাটো বেচাকেনার যা কারবার আছে তাও মাড়োয়াড়ীদের দখলে। এখানকার লোকদের জায়গা নেই কোথাওই।"

দুর্বোধ অর্থনীতির এই সমস্ত দুরূহ সমস্যায় আমার কৌতূহল নিতান্তই সামান্য। তৃষ্ণা নিবারণ করে কয়েক মুহূর্ত মাত্র পূর্বে যিনি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ কিছু ভাববার দুরভিসন্ধিও ছিল না আমার মনে। কিন্তু অপ্রীতিকর বিস্ময়ে মন ভরে উঠেছিল এই কথা ভেবে যে প্রকৃতির এমন পূর্ণপ্রকাশ মহিমার তলায় ভদ্রলোক কী করে ব্যবসায়িক চিন্তায় মনকে নিয়োজিত করতে পারছিলেন! কিন্তু সত্যি বোধ হয় বিস্ময়ের কারণ ছিল না।

নীরন্ধ্র একমনস্কতা হচ্ছে ঐহিক সাফল্য লাভের একমাত্র পন্থা। সাফল্যের শাস্ত্রে চুল বাঁধা নেই, আছে শুধু রাঁধা। সার্থক অ্যাকাউন্টেন্ট শুধু আপিসেই অপরের অর্থের শেষ কপর্দক পর্যন্ত নির্ভুল হিসাব রক্ষা করেন না। তাঁর বাড়িতেও বেহিসাব বেআইনি। সফল ডাক্তার শুধু রোগীকেই নাড়ী দেখে বিচার করেন না, নিজেকেও জ্ঞান করেন ফিজিওলজির বইয়ের চলন্ত একটা পৃষ্ঠা বলে। সত্যকার ব্যবহারজীবী তাঁর কূটনীতি শুধুমাত্র আদালতেই নিবদ্ধ রাখেন না, আপন স্ত্রীকেও জ্ঞান করেন তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর ধারিণী মাত্র বলে।

বরণীয় তাঁরা, স্মরণীয় তাঁরা। কিন্তু বৃত্তি ও প্রবৃত্তির এমন পরিপূর্ণ মিলন সকল ক্ষেত্রে ঘটে না। কোনো কোনো

ক্ষেত্রে জীবিকা আর জীবনে যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয় তার মতো অভিশাপ আর নেই পুরুষের জীবনে। এই দু' নৌকায় পা দিয়ে না হয় জীবিকায় উন্নতি, না জীবনের সুখ। জীবনকে বলি দিয়ে প্রমোশনের দড়ি বেয়ে সোণা-মোড়া স্বর্গে আরোহণ করা সম্ভব। আর সম্ভব জীবিকাকে অবহেলা করে আপন স্বর্গ রচনা করে তাইতে জীবনকে সার্থক করা। প্রথমের জন্মে চাই স্থূল শক্তি, দ্বিতীয়ের জন্যে সূক্ষ্ম অনুভূতি। প্রথমের আরাধনা আনে আরাম, দ্বিতীয়ের আনন্দ। প্রথমের প্রসাদ পায় ইন্দ্রিয়, দ্বিতীয়ের অন্তর। এক হয় সফল, আর হয় সার্থক। উভয়ই দাবী করে অবিভক্ত নিষ্ঠা।

কিন্তু সেই দুর্লভ নিষ্ঠা যার নেই তার ঘর করতে হয় জীবন আর জীবিকা-রূপিনী দুই বিবদমানা সতীন নিয়ে। তার সেই অমিত রায়ের মতো ঘড়ার জল আর সরোবরের দুস্তর ব্যবধানে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয় কষ্ট-কল্পিত সেতুবন্ধনে। সে না পারে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হতে, না পারে সর্বভোগী সংসারী হতে। তার দিনে চাই বাইরের কোলাহল, রাত্রে চাই গৃহের বিশ্রাম।

এই দ্বৈতবাদীকে তাই দ্বিমনা হয়ে দুলতে হয় দ্বিধার দ্বন্দ্বে। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তার মস্তিষ্ক বা পেশী নিয়োজিত থাকে পরনির্ধারিত কর্মচক্রে, এতটুকু স্বাধীনতা নেই সেখানে। কিন্তু বিকেল পাঁচটা থেকে পরদিন সকাল দশটা পর্যন্ত সে সকল বাধাবন্ধহীন, সম্পূর্ণ স্বাধীন। মস্তিষ্কের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে তখন সে নিজেকে সমর্পণ করে

হৃদয়ের স্বেচ্ছাদাসত্বে। তখন সে গান গাইতে না জানলে গান গায়, তুলি ধরতে না জানলে ছবি আঁকে। সমাজে তার পরিচয় নির্ভর করে দশটা-পাঁচটার কুশল সাফল্যের উপর, পাঁচটা-দশটার বিফল প্রেরণার উপর নয়।

আমার বিচারের মানটা কিন্তু একেবারেই আলাদা। আমি খবর নিইনে লর্ড ওয়েভেলের মধ্য-প্রাচ্য রণাঙ্গনের পরাক্রমের, খুশি হই লোকটার "আদার মেন'স ফ্লাওয়ারস্" নামক অক্ষম কাব্যসংগ্রহের পাতা উল্টে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ডেপুটিত্বে কী পরিমাণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তা নিয়ে আমার এতটুকু কৌতূহল নেই, কিন্তু তাঁর অসামান্য কাব্যপ্রিয়তা ও নাট্য-প্রিয়তার কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা না করে পারিনে। যদিও, এ ক্ষেত্রেও তাঁর কাব্যপ্রতিভা বা নাট্যপ্রতিভা কোনো মতেই অসামান্য ছিল না।

আমার সহযাত্রী কিয়ৎক্ষণ পরেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি তাঁর তথ্যবহুল আলোচনায় আদৌ মনোনিবেশ করিনি। অদম্য অমায়িকতার প্রেরণায় প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, "এখানকার লেবু কিন্তু খুব সস্তা। দাঁড়ান, কিনে নিয়ে আসি কয়েকটা।"

সরাসরি আকাশের তলায় কমলা লেবুর পসরা নিয়ে বসেছিল জনা ছয় পর্বত কন্যা। বাজারের অন্যান্য দোকানীদের মতো তাদের আননে ছিল না পারত্রিকতার গাম্ভীর্য। তারা শয্যা ত্যাগ করেছে, কিন্তু রজনীশেষের সুমধুর স্বপ্নের রেশটুকু বুঝি এখনো মিলিয়ে যায়নি। মৃদুস্মিত স্বপ্নের আভাস

যেন তাদের স্নিগ্ধ হাসিতে, ঘুমে-জাগরণে মেশা কী এক বিহ্বলতা ওদের চাহনিতে। কমলা লেবুর ঝুড়ি সামনে রয়েছে কিন্তু পসারিণীদের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ নেই। মৃদু হাস্যোদ্দীপ্ত চঞ্চল চোখ দু'টি বিচরণ করছে চতুর্দিকে, এদিকে হাতজোড়া বুনে চলেছে রঙীন পশমের গরম জামা। ত্বরিত হস্ত সঞ্চালনে কখনো বা ক্ষণিকের জন্যে সূর্যের আলো পড়ছে ওদের অলঙ্কারের 'পরে, স্বর্গের ঔজ্জ্বল্য পরিহাস করছে স্বর্ণের ঔদ্ধত্যকে।

কিন্তু ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নেই ওদের হাসিতে। স্নিগ্ধ তৃপ্তিতে তা পরিপূর্ণ। সূর্যের রৌদ্রের তা পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; প্রতিযোগী নয়, সহযোগী। ভোরের আলো সমস্ত জায়গাটাকে ভরে দিয়েছে অপরূপ এক অপার্থিবতায়। আলোকের সেই ঝর্ণাধারায় যেন ধুইয়ে দিয়েছে মৃত্তিকার স্পর্শের সকল মালিন্য। সব কিছুর উপর বিরাজ করছে নির্মল আনন্দের নির্ভুল প্রতিরূপ। এই অবর্ণনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশে লেবু-বিক্রেত্রী পর্বত-কন্যাদের প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন অংশ বলেই প্রতীয়মান হয়। ওরা যেন মানবরূপিনী নির্ঝরিণী। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে ওদের নয়, ওরা প্রাণঝরণার উচ্ছল ধার। ওদের লজ্জা আছে কিন্তু জড়তা নেই, চপলতা আছে কিন্তু চটুলতা নেই। ওরা আমার দেখা বাঙালী মেয়ে থেকে একেবারেই বিভিন্ন।

আমার অনুচ্চারিত অভিলাষ অনুযায়ী পর্বত-কন্যাগণ যে ব্যবসায় অপেক্ষা বিলাস সম্বন্ধেই অধিক মনোযোগী, সহযাত্রী কমলালেবু বিতরণ করতে করতে তারই সবিস্তার উল্লেখ করলেন,

"লেবু বেচবে না জামা বুনবে? আমি লেবুর দাম জিজ্ঞেস করাতে ওদিকের ওই মেয়েটা তো হেসেই আকুল।"

কার সমর্থনে জানি না—ভদ্রলোকের অভিযোগের না অভিযুক্তার—আমি বললেম, "হাসি ছড়ানো আছে এখানকার ভোরের হাওয়ায়। আর ওরা তো এখানে লেবু বেচতে বসেনি বসেছে রোদ পোহাতে!"

"তা যা বলেছেন।"

সহযাত্রী দৃশ্যতই খুশি হলেন। কিছুক্ষণ পরে কমলা-ওয়ালীদের বয়নচাতুর্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "চমৎকার বোনে কিন্তু মেয়েগুলো। একবারও তাকাতে হয় না কাঁটাগুলোর দিকে, হাত চলেছে যেন মেসিন। এদের এইটে আমার বেশ লাগে, যে যার জামা নিজে বুনে নিচ্ছে।"

শুধু যে নিজেরই জন্যে গরম জামা বোনা হয় না তার প্রমাণ ছিল আমার নিজেরই গায়ে। বিশেষ এক জনের উপহার সেটি। বিশেষ একটি মৃত্যুহীন মুহূর্তের মূল্যহীন স্মারক।

কালিদাসের কালে প্রিয়সখী তার প্রিয়বরের মেখলায় ছুলিয়ে দিত নবনীপের মালা। মহাকবির সঙ্গে সেদিনের সেই পৌরনারী নিপুণিকা চতুরিকা মালবিকার দল আজ চিরতরে অন্তর্হিত হয়েছেন। তাঁরা এখন অন্য নামে মর্তলোকে আছেন হয়তো, কিন্তু মাল্যরচনায় সেই পারদর্শিতা আর নেই। আজকের উপহারের তাই ধারা পরিবর্তন করতে হয়েছে। আজকের নিপুণিকা তাঁর প্রিয়কে উপহার দেন স্বহস্তে রচিত

জাম্পার, সুয়েটার বা পুলোভার। তা থেকে আজকের কবি মহাকাব্য সংরচনের অনুপ্রেরণা যদি না পান তা নিয়ে ক্ষোভ করব না। কিন্তু পৌষের শেষের দার্জিলিং-যাত্রীর অমন উপহারের জন্যে কৃতজ্ঞ না হয়ে উপায় নেই। কৃতজ্ঞতামুদ্রিত নয়নের সম্মুখে উপহারদাত্রীর আননের সুস্পষ্ট ছবি ভেসে উঠল।

"আরে, তুমি যে!"

উত্তমর্ণ মুলতানীর সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই নিরতিশয় অপ্রীতিকর, দারোগার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াও নিশ্চয়ই কোনো আনন্দাপ্লুত অনুভূতির সঞ্চার করে না। কিন্তু চলতি ইংরেজিতে যাকে পুরাতনী শিখা বলে তার সম্মুখীন হওয়ার মতো বিড়ম্বনা বোধ হয় আর নেই।

অতি-পরিচিত সেই কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী যে শিখা দেবীই তাতে সন্দেহের বাষ্প মাত্র ছিল না আমার মনে। দৃষ্টি তা নিমেষেই সমর্থন করল। বিমূঢ় প্রতিধ্বনির মতো বললেম, "আরে, শিখা যে!"

"যাক্, চিনতে পেরেছ তাহোলে?"

বাচনের জিজ্ঞাসা-চিহ্ন সত্ত্বেও উত্তর দেওয়া থেকে বিরত রইলেম এজন্যে যে আমি, ঠিক প্রশ্নকর্ত্রীরই মতো স্পষ্ট করে জানতেম যে অদম্য জ্ঞানপিপাসা থেকে প্রশ্নটি উদ্ভূত হয়নি। জিজ্ঞাসা ছাড়া আর যা শ্লেষগর্ভ বিস্ময় নিহিত ছিল শিখার

উক্তিতে, তার যোগ্য উত্তর দিতে হলে রূঢ়-ভাষণের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। বৈরিতায় নারী অপর পক্ষের ভদ্রতার সুযোগ গ্রহণ করতে কখনোই কুণ্ঠাবোধ করে না—শিখা জানতো যে আমি উত্তর করব না।

"নেমে এসো গাড়ি থেকে। আমার সঙ্গে চা খাবে চলো।"

আদেশ অমান্য করব এমন সাধ্য ছিল না। শীতের ভয়ে গরম পোশাকের বোঝার বৃহৎ একটা অংশ ইতিমধ্যেই বাক্স থেকে দেহে স্থানান্তরিত করেছিলেম। বস্ত্রাধিক্য বশত গাড়ির অভ্যন্তরে একটু বুঝি গরমই লাগছিল। বেরুনো মাত্রই শীতের হাওয়া কোট-ওভারকোট ইত্যাদি সব কিছু ভেদ করে সর্বদেহে দংশন করল। কিন্তু শীতের হাওয়া যে মানবের কৃতঘ্নতার তুলনায় নিতান্তই অনির্দয়া, শেক্স্পীয়রের তদর্থক উক্তির প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের সান্নিধ্যে শীতবোধ সহনীয় হোলো। নৈঃশব্দের যবনিকা তুলল শিখাই।

"হঠাৎ এমন দেখা হয়ে যাবে একবারও ভাবিনি।"

"আমিও না।"

"জানলে বুঝি আসতেই না এ-পথে?" আবার সেই অপর পক্ষের ভদ্রতার উপর অকুণ্ঠ নির্ভরতা। দেবভাষার শব্দ-ঝংকারের অন্তরালে উষ্মা গোপন করে প্রসঙ্গান্তরে নিষ্ক্রমণের পথ সন্ধান করলেম।

"প্রশ্নটা একান্তই প্রাকল্পিক। তার চেয়ে বলো, তুমি এখানে কেন?"

"কেলনারের দোকানে যিনি অপেক্ষা করছেন তাঁর কর্মস্থল

সোনাডায়। ঘুমে আসতে হয় প্রায় রোজই। তাঁরই অনু-
গামিনী হয়ে এখানে এসেছি।” হঠাৎ, যেন কেউ শুনতে
পাবে, গলার স্বর নামিয়ে বলল, “বসবে একটু ঐ ব্রিজটার
তলায়, যেখানে পাথরের বুকে ঘাস উঠেছে?”

আমার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পূর্বেই শিখা আবিষ্কার করল যে,
অপেক্ষমান ভদ্রলোক অধৈর্য হয়ে আমাদের অভিমুখে অগ্রসর
হচ্ছেন। নিমেষে নির্বাপিত হোলো শিখার উপবেশন স্পৃহা,
বলল, “থাক, চলো চা খেয়ে নেয়া যাক।” আমি নীরবে
তার অনুগমন করলেম।

“ও এদিকেই আসছে। অন্য কথা বলো। তা নইলে ও
হয়তো ভুল বুঝবে।”

“অর্থাৎ ঠিক বুঝবে, না?”

নগ্ন-সত্যভাষণে শিখা আহত হোলো। কিন্তু সময় কোথা
সময় নষ্ট করবার? তাড়াতাড়ি ব্যাগের থেকে একটা বই বের
করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, “এইটেতে পাবে আমার
জিদালিঙের ঠিকানা। তিন দিন পরেই ওখানে যাবো দিন
পনেরোর জন্য। অনুনয় রইল, একবার দেখা করবে।”

ভদ্রলোক কাছে আসতেই শিখা অদ্ভুত স্বাভাবিকতার সুরে
পরস্পরের নাম ঘোষণা করে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, “ইনি
হচ্ছেন আমার—”

ইংরেজি ব্যাকরণের পোসেসিভ্ প্রোনাউনটা ব্যবহার করে
শিখা বিপদে পড়ল। আমি কথা জুগিয়ে বললেম, “বন্ধু।”

শিখার সেটা মনঃপূত হোলো না। বলল, “ইনি হচ্ছেন

আমার দাদার বন্ধু।" পতিদেবতার অলক্ষ্যে বন্ধুভগিনী তাঁর জুতো দিয়ে আমার পা মাড়িয়ে দিয়ে আমাকে শাসন করলেন।

অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে আমি যখন তাঁদের সঙ্গে চা পান করছিলেম ভদ্রলোক সেই পুরাতন প্রশ্ন তুললেন, "এই অকালে দার্জিলিং চলেছেন যে?"

"ছুটিতে বেড়াতে।"

এই ভদ্রলোকও ঠিক আশংকানুরূপ বিস্ময় প্রকাশ করে যোগ করলেন, "এই শীতে দার্জিলিং এন্‌জয় করতে পারবেন না কিন্তু।"

"এন্‌জয়মেণ্টের জন্যে তো যাচ্ছিনে, যাচ্ছি পানিশ্‌মেণ্টের জন্যে।" হেসে সত্যকে পরিহাসের রূপ দিতে চেষ্টা করলেম।

"শাস্তি কেন? কী ক্রাইম করলে আবার?"

"অপরাধটা অপরের, শাস্তিটাই শুধু আমার।"

স্বামীজি আমাদের কথা আর শুনছিলেন না, খবরের কাগজে মন দিয়েছিলেন। শিখা নিঃশব্দে হাসছিল। প্রাচীন রোমের কলীসিয়মের ক্রীড়া-উপভোগরতা দৃপ্ত-সম্রাজ্ঞীর পরিতৃপ্ত হাসি।

সেই হাসি লক্ষ্য করে আমি কৌতুকবশে মনে-মনে আবৃত্তি করছিলেম, 'পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি; মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।' শিখা সেই আবৃতি শুনতে পেলে জ্বলে উঠতো: আমার ঘটতো বন্ধুবিচ্ছেদ। শিখার দাদার সঙ্গে নয়, তাঁর বোনের সঙ্গে।

অনেকগুলি মধুর ভুল আছে যা না ভাঙাই ভালো।

চার

দীপান্বিতা রাত্রির অবসানে সূর্যোদয়ের পরে পুড়ে যাওয়া বাজি এবং নিবে যাওয়া প্রদীপগুলি যে করুণ দৈন্যের দৃশ্যের সৃষ্টি করে তার মর্মান্তিক প্রতিরূপ আছে পৌষের শেষের দার্জিলিঙে। মুখর উৎসবের স্তব্ধিত কলরব বিরহীর দীর্ঘ-শ্বাসের মতো হাওয়ায় হাওয়ায়পরিব্যাপ্ত হয়ে জনহীন জনপদের শূন্য গৃহের রুদ্ধ বাতায়নে বৃথাই আঘাত করে ফিরছে। শরতের অতিথিরা বিদায় নিয়েছে, বসন্তের অতিথিরা আসেনি এখনো। বিগতের জন্যে নীরব বেদনা ও অনাগতের জন্যে অধীর প্রতীক্ষা, এই মিশ্রিত অনুভূতির আভাস আছে উতল হাওয়ার ব্যাকুল সুরে।

আজকের দার্জিলিং তাই একেবারেই রিক্ত। এ যেন সকাল দশটায় ড্যালহৌসি স্কোয়ার থেকে ফিরতি ট্রাম— কিছুক্ষণ পূর্বেও যেখানে তিলধারনের স্থান ছিল না এখন সেখানে বিরাজ করছে অসহায় শূন্যতা। এ যেন দিনের বেলার নাইট ক্লাব, রাতের বেলায় ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

এই শ্রীহীন বৈধব্যের করুণতম বিকাশ আছে ম্যাল নামক জায়গাটায়। দার্জিলিং শহরের এটা হৃৎপিণ্ড। কর্মক্লান্ত সমতলবাসী যখন বৎসরের নির্দিষ্ট পর্যায়ে সদলবলে এই শৈলা-বাসে আরোহন করেন, এই ম্যাল তখন নবরূপ পরিগ্রহ করে

কর্মবীরদের অভ্যর্থনামানসে। ঋতুরাজ বসন্তের কাছে বর চেয়ে নেয় চিত্রাঙ্গদার মতো। তখন সকল ক্লান্তির সে যে বিশ্রামরূপিণী।

আমরা যারা ওল্ড টেষ্টামেন্টের প্রতিশোধপরায়ণ বিধাতার অভিশাপবশে স্বেদের বিনিময়ে অন্ন সংগ্রহ করি তারা এমন কথা শুনে হাস্য সম্বরণ করতে পারিনে যে সরকারী কর্ম্মচারী-দের আবার বিশ্রামের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে খেদ করে লাভ নেই। রাষ্ট্রের কর্তব্যের পরিধি আজ আর আইন আর শৃংখলা বিধানেই নিবদ্ধ নেই, তার দীর্ঘ বাহু আজ দীর্ঘতর হতে হতে ব্যক্তি-জীবনের বহু প্রশাখা পর্যন্ত প্রসারিত। কোন দেশেই রাষ্ট্র আজ রাস্তায় আলো জ্বালিয়ে ক্ষান্ত নেই, কোনো কোনো দেশে সে মনের আলো নিবিয়ে দেবারও ভার নিয়েছে।

কর্তব্যের বিস্তৃতি হওয়াতে কর্মের বৃদ্ধি হয়েছে কিনা জানিনে, কিন্তু কর্মচারীর ঘটেছে সংখ্যা-বৃদ্ধি। শুধু সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, শক্তি-বৃদ্ধি। নানাবিধ নিয়ন্ত্রণের কল্যাণে রাজকর্মচারীর প্রতিপত্তি আজ অপরিসীম। প্রচুরতম লোকের প্রভূততম কল্যাণসাধনের অছিলায় সে-প্রতিপত্তি আজ নিয়ত প্রসরমান। তা নিয়ে আজ আমাদের প্রতিবাদও বৃথা।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। তাঁর বদলে জার্মান দার্শনিক সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করলেন। সে রাজত্বের সনদ রচনা করলেন অপর একজন নির্বাসিত জার্মান। তৃতীয় একজনের উপর ভার পড়ল সে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা

করবার। সেই সর্বক্ষম রাষ্ট্রকে স্থায়িত্বে অধিষ্ঠিত করতে চতুর্থ যে স্বয়ং-নির্বাচিত নেতা তাঁর রক্তাক্ত হস্ত নিয়োজিত করলেন, তিনি প্রকাশ্যভাবে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রত্যাখ্যান করেছেন সত্য, কিন্তু তা সত্বেও প্রতি দেশেই অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে স্বনামে বা বেনামে বহু গুপ্ত বা প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠান। সে প্রতিষ্ঠানগুলির জনপ্রিয়তা অধিকাংশ দেশেই অত্যন্ত পরিমিত কিন্তু ওদের মতামতের সহজবোধ্য কয়েকটা বুলি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বহু সমাজের একাধিক স্তরে। পুনঃকথনের ফলে এ-ধারণা আজ বহুজনগ্রাহ্য হয়েছে যে রাষ্ট্রের হাতে অধিক হতে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানই সকল সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান। এই বিশ্বাস আজ এতই ব্যাপক যে, যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি আজও রাষ্ট্র-স্বাধীন আত্মনির্ভর জীবনাদর্শে আস্থাবান তারা এ নিয়ে বিলাপ করলে বিলোপের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়। আমাদের ভীরু অভিযোগ আজ তাই অরণ্যে রোদন মাত্র। বিকল্পে, পর্বতে।

নূনতম কর্মের জন্যে উচ্চতম বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীবৃন্দ শরতের শেষে কর্মস্থানে প্রত্যাবর্তন করেছেন। রাষ্ট্ররথের রশী আবার দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ হয়েছে। দার্জিলিং মুক্তি পেয়েছে সেই উদ্ধত অভ্যাগতদের কবল থেকে। আজ আর অতিথির তুষ্টিবিধানের দায় নেই। আবার দার্জিলিং আপনাতে আপনি সমাহিত হয়েছে। ম্যালের বেঞ্চিগুলিতে আজ আর সুখী দম্পতিদের প্রকোপ নেই, হিমালয়ের প্রতিনিধি বুজ্‌ঝটিকা হয়ে আবার তার জায়গা করে নিয়েছে সেখানে।

শুধু ম্যাল নয়, ম্যালের উচ্চতা থেকে যেদিকেই তাকাই কুয়াশা আর কুয়াশা। ভারী একটা দুশ্চিন্তার জগদ্দল পাথরের মতো, ডস্টয়েভস্কির গল্পের মতো, গভীর একটা শোকের মতো, কুয়াশা যেন তার অন্তহীন আয়তন নিয়ে চেপে আছে গোটা দার্জিলিঙের বুকের উপর। এ কুয়াশা যেন আদিকালের সৃষ্টির প্রথম জন্তু—এর চোখ নেই, কান নেই; আছে কেবল মস্ত একটা বিস্তৃতি। এর আবেগ নেই, কিছুতেই বিচলিত হতে জানে না, জানে শুধু গালে হাত দিয়ে ভাবতে। এর গতি নেই, মতি নেই; আছে শুধু স্থিতি, আছে শুধু ভার। আর আছে নিশ্ছিদ্র অনচ্ছতা। দু'হাত দূরের জিনিস দেখবার উপায় নেই; পুরোপুরি প্রসারিত করলে নিজের হাতকে নিজের বলে চিনতে কষ্ট হয়। আমি বসে আছি আমার বেঞ্চিটার এক প্রান্তে, অপর প্রান্ত কুয়াশার অন্তরালে অদৃশ্য। আমি এখানে একেবারে একা। আর কেউ থাকলেও দেখবার উপায় নেই। দৃষ্টি এখানে সম্পূর্ণ পরাভূত।

ফী ফ ফাম্...

হঠাৎ একটা ক্ষীণ, স্তিমিত আলো অদূরে জ্বলে উঠে পর মুহূর্তেই নির্বাপিত হোলো। কুজ্ঝটিজন্তুর এ যেন বিদ্রূপগর্ভ দন্তবিকাশ। ভীত বিস্ময়ে সমস্ত চেতনা আমার শিহরিত হয়ে উঠল। এর চেয়ে নিরবচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গতায়ও যে অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করেছিলেম! তৎক্ষণাৎ উঠে যে আস্তানা অভিমুখে অগ্রসর হবো তারও উপায় ছিল না। শীতজর্জর দেহ

অসাড় হয়েছিল পূর্বেই। ভয়ে এখন উত্থানশক্তির সর্বশেষ কণাটুকু যেন নিঃশেষিত হয়ে গেল।

আবার আলোটা জ্বলে উঠে দপ করে নিবে গেল।

আমি দস্তানা দু'টো আরো জোরে টেনে অনাবৃত কব্জীটা ঢেকে দিলেম। তেমনি অনাবশ্যক ভাবে মোজা দু'টো বেঁধে নিলেম আরো শক্ত করে। গায়ের গরম জামাটার কলার তুলে দিয়ে ঘাড়ের দিকটার রক্ষার ব্যবস্থা করলেম। কিন্তু কিছুমাত্র নিরাপদ বোধ করলেম না।

আবার!

এবারে যেন আরো একটু কাছে। কুয়াশার কণাগুলি যেন কাঁটা হয়ে আমার গায়ে বিঁধতে লাগল। আমি ভয়ে চোখ বুঁজে রইলেম—যে-চোখ দেখতে পায় না, কাজ কী অমন চোখ খুলে রেখে? চোখ খুলতে হোলো কানের টানে। হঠাৎ নিঃসীম শূন্যতার মধ্য থেকে যে বীভৎস শব্দ ধ্বনিত হোলো তাকে মানববোধ্য কোনো ভাষায় অনুবাদ করলে শোনালো:

"গুড ঈভনিং!"

আমি যে তখনি তারস্বরে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চীৎকার করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবন করিনি তার কারণ কণ্ঠ এবং পদদ্বয়ের পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা। চীৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। আমার দিক থেকে সামান্যতম চেষ্টা ব্যতিরেকেও আমার কণ্ঠ থেকে যে আর্ত স্বর নিঃসৃত হোলো 'শুভ সন্ধ্যা' আবাহনের অদৃশ্য বক্তা তাকেই আমার আন্তরিক প্রত্যুত্তর বলে ভ্রম করলেন বোধ হয়।

"বসতে পারি এখানে ?"

আমার ভীত নৈঃশব্দ প্রবাদ অনুযায়ী সম্মতি সূচনা করল।

একসঙ্গে বেদ, বাইবেল ও কোরাণের উপর হাত রেখে শপথ করে বলতে পারি, আমার পার্শ্বে যে-বস্তুটি উপবেশন করল তাকে জীবন্ত একটা মানুষ বলে মনে করবার কিছুমাত্র কারণ ছিল না। অতিকায় একটা ওভার-কোট যেন এক-জোড়া প্যাণ্টালুনে চড়ে অনেক ঘুরে শ্রান্ত হয়ে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল। ম্যাজিকে ব্ল্যাক্ আর্ট দেখেছি, যাতে অসংখ্য জড় পদার্থ স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করে মঞ্চের উপর ঐন্দ্রজালিকের যষ্টির নির্দেশে। সূচীভেদ্য ধূসরতায় এ কেমন যাদুক্রীড়া ? হস্তপদশূন্য এ কোন নিস্পন্দন প্রাণী ?

প্রথম প্রাণের সন্ধান মিলল দীর্ঘ কতকগুলি আঙুলের ধীর-মন্দ গতিশীলতায়। বাঁদুরে টুপিটা একটু সরলে যে বিকৃত, বন্ধুর মাংসপিণ্ড দৃশ্যমান হলো, মানুষের মুখের সঙ্গে তার সাদৃশ্য সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ হয়নি, তার অবর্ণনীয় ভয়াবহতা স্পষ্টতর হয়েছে মাত্র। বৃহদাকৃতি পরিচ্ছদের সহস্র ভাঁজের শূন্যতা থেকে এ-কথা বুঝতে একটুও দেরী হয় না যে ওই পোষাকের গর্ভে অন্তত তিনটি পূর্ণাবয়ব মানুষের সুপরিসর স্থান হতে পারতো। বর্তমানে সে পোষাকের মধ্যে যে ছিল তাকে একটি মানুষ বললেও অতি-কথনের অপরাধ হবে। কম্পিত হস্তে একটা অর্ধসিক্ত সিগারেট এগিয়ে দিয়ে তিনি যা বললেন, দন্তহীনতাজনিত অবোধ্যতার জন্যে তার অর্থ

উদ্ধার করা অসম্ভব হতো যদি না তার ব্যাখ্যারূপে বক্তার হাতের মুদ্রা প্রত্যক্ষ হতো।

"এটাকে ধরিয়ে দিতে পারো?"

এতক্ষণে বোঝা গেল এর আগে কেন আলো দেখেছিলেম। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে আমার পকেট থেকে দেশলাইটা বের করে অনাহূত আগন্তুকের সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করতে চেষ্টা করলেম। সিগারেট ধরাতে পারবার পূর্বেই দেশলাইর কাঠি নিবে গেল। কিন্তু সেই ক্ষণিক আলোতে ধূম-পিয়াসীর যে মূর্তি নিরীক্ষণ করলেম তাতে মন একই সঙ্গে ভয়ে ও করুণায় ভরে উঠল।

ভদ্রলোক স্পষ্টতই ইংরেজ। উচ্চারণ-ভঙ্গী থেকে পূর্বেই তা অনুমান করেছিলেম, এখন আর সন্দেহ রইল না। এঁর দেহের আসল দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে একটা ধারণা করবারও উপায় ছিল না, কেননা তা বক্রত ভাবে বক্র। সমস্ত মুখটা এমন অসংখ্য কুঞ্চনে ক্লিষ্ট যে তারও আসল চেহারাটা বোঝবার উপায় নেই। বার্ধক্যের এমন বিকট বীভৎসতা, জড়তার এমন নগ্ন জীর্ণতা, স্থবিরতার এমন করুণ অসহায়তা এর আগে আর দেখিনি।

আমি আবার দেশলাই জ্বালিয়ে তাঁর সিগারেট ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেম। এবারেও হোলো না। আবারও না। বৃদ্ধের দন্ত-বিহীন মুখ-গহ্বরে স্থিত সিগারেটের সামনে যেই মাত্র আলোটা এগিয়ে নিয়ে যাই অমনি সেই মুখ-নিঃসৃত বায়ুর ফুৎকারে দেশলাই নিবে যায়। সিগারেট আর ধরানো

হয় না। এমনি প্রায় দশ মিনিটের মর্মান্তিক প্রয়াসের পরে বৃদ্ধের শ্লথ হস্ত বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। নৈরাশ্যমগ্ন কণ্ঠে বললেন, "থাক, হবে না।"

আমার গত জন্মদিনে পরিহাস করে বলেছিলেম, সাতাশ হলে না কেন এক শ' সাতাশ? আজ এই মুহূর্তে সে কথা সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাহার করলেম। ধূমপানের মতো সামান্য পিপাসা নিবৃত্তির সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত বার্ধক্যের এই মর্মন্তুদ অবস্থা দেখে অকালমৃত্যুও পরম লোভনীয় মনে হোলো।

কিছুক্ষণের নৈঃশব্দ্যের পরে মহাস্থবির আমার দিকে তাঁর লালাসিক্ত সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে! এটা তুমি মুখে দিয়ে ধরিয়ে দাও। আমার ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে বোধ হয় একটা হোল্ডার আছে, সেটা বের করে দিলে আমি তাইতে বসিয়ে সিগারেটটা খেতে পারি।"

সৌজন্য রক্ষার জন্যে বৃদ্ধের সেই সিগারেটটা গ্রহণ করলেম বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর অলক্ষ্যে সেটা নিক্ষেপ করলেম বেঞ্চির অদৃশ্য পশ্চাতে। আমার নিজের পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে দেবার আগে হোল্ডার অন্বেষণে উদ্যোগী হলেম।

ওভার কোটটার বোতাম খুলতেই আমার শীতল হাতের স্পর্শে বৃদ্ধ এমন শিশুর মতো আর্তনাদ করে উঠল যে আমি আর অগ্রসর হতে সাহস করলেম না। বৃদ্ধ ইঙ্গিতে জানাল

যে, ও কিছু নয়। বুকের কাছটায় হাত দিয়ে আবার সেই ব্ল্যাক আর্টের চলন্ত কঙ্কাল প্রদর্শনের কথা স্মরণ হলো। খানকয় পাঁজর ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না বৃদ্ধের দেহে। মনে মনে বললেম, হায় ঈশ্বর, এ তোমার কেমন পরিহাস যে এমন অক্ষম বৃদ্ধকে কঠিনতম শীতের মধ্যে শৈলশিখরের নিঃসঙ্গতায় নির্বাসিত করে রেখেছ?

ধূমপান করে বৃদ্ধ যেন কিঞ্চিৎ শক্তি ফিরে পেল। প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে প্রশ্ন করল "তোমাকে দেখে তো এখানকার লোক বলে মনে হচ্ছে না। এমন অসময়ে এখানে কেন?"

দার্জিলিঙে অসময়ে অবস্থিতি নিয়ে বৃদ্ধের প্রশ্নে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। বললেম, "এমনি এসেছি। কিন্তু তোমার এ-বয়সে তুমি এখানে পড়ে আছো কেন?"

বিকট হাসি হেসে বৃদ্ধ বলল, "আমি? আমি আবার কোথায় যাবো?"

"কেন, নিজের দেশে?"

"কুইট ইণ্ডিয়া?"

আমার প্রশ্নে রাজনীতির বাষ্পমাত্র ছিল না। কিন্তু আপন অজ্ঞাতসারে বৃদ্ধের মনে ব্যথা দিয়েছি ভেবে অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেম। বুঝিয়ে বললেম, "রাজনীতি আলোচনা করব না তোমার সঙ্গে, তবে বিশ্বাস করো, তোমার দেশে যাওয়ার কথা বলবার সময় কেবল মাত্র তোমার বয়স ও দার্জিলিঙের আবহাওয়ার কথাই মনে ছিল, আর কিছু না।"

বৃদ্ধ আবার সেই হাসি হেসে বলল, "না না, কিছু মনে

করিনি আমি ; তা ছাড়া, আমাকে ভারত ছাড়তে বললেও তো ছাড়তে পারবো না আমি। যাবো কোথায় ?"

আবার সেই প্রশ্ন। আমি নিরুত্তর রইলেম। জানতেম যে বৃদ্ধ তার প্রশ্নের উত্তর নিজেই দেবে।

"আচ্ছা, পঁয়ষট্টি বছর একটা দেশে থাকলেও সে-দেশ স্বদেশ হয় না ?"

বৃদ্ধের সঙ্গে তর্ক করবার কিছুমাত্র অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু মনে মনে ভাবছিলেম সদ্য-সমাপ্ত ইঙ্গ-ভারত সম্বন্ধের কথা। প্রায় দু'শো বছর ধরে দু'টো জাতি পরস্পরের কাছ থেকে এত নিল, এত দিল। কিন্তু একদিনের জন্যেও কেউ কাউকে আপন করে জানল না। দু'জনে রইল দু'জনের নির্দিষ্ট দূরত্বে। একজন রইল আপন অপমানাহত বিদ্বেষ নিয়ে, অপর জন রইল তার দর্প আর দম্ভ নিয়ে। একবারও কেউ কাউকে বন্ধুভাবে পেতে চাইল না, বুঝতে চাইল না পরস্পরকে। দু'শো বছরের দেয়া-নেয়ার পরেও দু'জনে রয়ে গেল দু'জনের কাছে একান্ত অপরিচিত।

কবি-কথিত ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে ইংরেজ আজ ভারতের শাসন-ভার পরিহার করতে বাধ্য হয়েছে। শাসক-শাসিত সম্বন্ধের ঘটেছে সমাপ্তি। মহাসমারোহে আমরা সমাধি দিয়েছি প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কটার ঘৃণ্য ইতিবৃত্ত। ক্ষমতা হস্তান্তরকালে উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের ওজস্বিনী বক্তৃতায় ধ্বনিত হয়েছে পারস্পরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন। কিন্তু এই সমস্ত রাজনীতিক বক্তৃতা—সংবাদপত্রের শিরোনামায় যেগুলি ঐতিহাসিক বলে

বর্ণিত হয়—মহাকালের পাতায় সেগুলির অবস্থিতি বড়ো সাময়িক, চিরন্তনীর পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির মূল্য বড়ো অকিঞ্চিৎকর। কালস্রোতে সেগুলি ভেসে যায় বড়ো সহজে। তার পরে বাকী রইবে কী? দু'শো বছরের ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগের এমন কী থাকবে যা দু'জাতি স্মরণ করতে পারবে মধুর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে?

একেবারে কিছু না! ওরা মনে রাখবে, কুইট ইণ্ডিয়া। আর আমাদের স্মৃতিতে রক্ত ক্ষরবে জালিনওয়ালাবাগ!

এই ভুল বোঝায় দোষ নেই কারোই। অর্থাৎ দোষ দু'পক্ষেরই। বৃটেন ভারতকে শাসন করেছে, ভারতীয়গণ বৃটিশ জাতি কর্তৃক পদানত হয়েছে। অর্থাৎ, একটা দেশ আরেকটা দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছে, একটা জাতি আরেকটা জাতিকে শোষণ করেছে। অর্থাৎ, দেশ নামক একটা প্রত্যয়ের নামে বৃটিশ নামক একটা লোকসমষ্টি এমনিতর আরো দু'টো অস্পৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ ধারণার উপর জয়লাভ করে মিথ্যা গর্বে স্ফীত হয়েছে। এক জাতি অপর জাতিকে অবজ্ঞা করেছে, এক দেশ অপর দেশকে ঘৃণা করেছে।

ব্যাপারটা আগাগোড়াই জেনারালাইজেশন। কিন্তু জীবন্ত একজন বৃটন তার জাতি, দেশ, বর্ণ ইত্যাদির কথা বিস্মৃত হয়ে যখনই মানুষ হিসাবে জীবন্ত একজন ভারতীয়ের সম্মুখীন হয়েছে, তখনই দেখা গেছে যে দু'জনের কেউই মনে রাখেনি বিজয়ের অভিমান বা পরাভবের গ্লানি।

একক ব্যক্তি রূপে, মানুষ রূপে, যখনি দু'জনে মিলেছে

তখনি দু'জনের মিল হয়েছে, সকল বিরোধ অপনীত হয়েছে অল্পতম পরিচয়ে।

নখদর্পণে যাঁরা বিশ্বরূপ দেখতে পান, একটি মাত্র বাক্যে যাঁরা গোটা একটা জাতির চরিত্রের পরিপূর্ণ পরিচয় দিতে পারেন, তাঁদের সর্বজ্ঞতায় সন্দেহ করি না। কিন্তু আমি রাজনীতিক নই! সমষ্টির নেতৃত্ব করা আমার পেশা নয়। আমার পরিচয় পৃথক পৃথক বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে। বহু ঠেকে শিখেছি যে সেই সাধারণ সূত্রগুলি কী মারাত্মক রকম ত্রুটিপূর্ণ। আজ আর তাই বলিনে যে, 'ও! ইংরেজ জাতটাই অমন!' কেন না আমি দেখেছি পঞ্চান্নর মন্বন্তরে বৃটিশ সৈনিক স্বেচ্ছায় তার পরিমিত রেশনের অংশ দিয়েছে একান্ত অপরিচিত ভারতীয় বুভুক্ষুকে। সাহস করে এমন কথাও আর বলতে পারিনে যে নারী জাতিটাই অমন বা তেমন; কেন না অমন যদি দেখে থাকি ছ'জন, তেমন দেখেছি আধ ডজন।

একান্ত অক্ষম যে বৃদ্ধ আমার পাশে বসে করুণ কণ্ঠে পঁয়ষট্টি বছরের অবস্থিতির কথা নিবেদন করে নাগরিকতার আবেদন জানিয়েছে, একবারও তাকে শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে অন্তর থেকে ঘৃণা করতে পারলেম না। এক মুহূর্তের জন্যেও এমন কথা মনে ঠাঁই পেল না যে এরই ভাই কলকাতায় গুলী চালিয়েছে, হিজলীতে ঘর জ্বালিয়েছে। সকল ঘৃণা, সকল বিদ্বেষ, সকল অভিযোগ নিমেষে কোথায় ভেসে গেল। মনে রইল শুধু অশ্রুসিক্ত অনুকম্পা। বার্ধক্যের কি বর্ণ-বৈষম্য আছে? না, দুঃখের আছে জাতিভেদ?

বৃদ্ধের কাছে একটু এগিয়ে বসে বললেম, "তোমার বয়সে এই ঠাণ্ডা কি ভালো ?"

হঠাৎ দস্তানা থেকে হাত বের করে বৃদ্ধ তার হিমশীতল আঙুলগুলি রাখল আমার অনাবৃত মুখের উপর। আমি চমকে উঠতেই প্রবল হাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "কেমন, খুব ঠাণ্ডা তো ? ঠাণ্ডা হাতের মানে কী জানো ?"

আমি প্রশ্নটার তাৎপর্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে বললেম, "কী আবার ? তোমার হাত ঠাণ্ডা মানে তোমার হাত গরম নয় !"

"হোলো না, হোলো না। কোল্ড হ্যাণ্ডস্ মীন ওয়র্ম হার্টস। যার হাত যত ঠাণ্ডা, হৃদয় তার তত উষ্ণ।"

"তাই নাকি !" আমি তাড়াতাড়ি এই প্রসঙ্গের শেষ করতে চাইলেম। হৃদয় নিয়ে আলোচনায় 'অনেক বাঁকা গলিঘুঁজি !'

হঠাৎ কণ্ঠের লঘুতা পরিহার করে বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে স্বগতোক্তির মতো বলল, "এই দারুণ শীতেও যে এখানে শরীর নিয়ে আজো বেঁচে আছি সে তো এই হৃদয়ের উষ্ণতা নিয়েই !"

প্রথম শৈশবের মতো দ্বিতীয় শৈশবেরও বৈশিষ্ট্য এই যে প্রকাশে তার আনন্দ। দু'য়েরই ধর্ম বাচালতা। আমি শৈশব বহুকাল ছাড়িয়ে এসেছি, বার্ধক্যে পৌঁছোতে কিছুদিন বাকী। তার উপর শিখেছি যে কৌতূহল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিকতা-সম্মত নয়। আমি চুপ করে রইলেম।

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ বলল, "আমার নাম কলিন, আর্থার কলিন।"

আমিও যথারীতি আমার নাম নিবেদন করলেম, কিন্তু তার বেশি নয়। অপর পক্ষ পাশেই উপবিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু ঘন কুয়াশার জন্যে অতি কাছের মানুষও হয়েছিল অদৃশ্য, নিকটও হয়েছিল দূর।

আমার অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ্যে বৃদ্ধের বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বলল, "তোমাকে যে দেখতে পাচ্ছিনে এই ভালো। জানি কাছে বসে আছো, কিন্তু দেখতে পাচ্ছিনে।"

বৃদ্ধের দুর্বোধ উক্তিতে আমার রূপের প্রশংসা নিহিত ছিল না! কিন্তু তবু আমি পরিহাস করে বললেম, "সে জন্যে আপনার অনুশোচনার কারণ নেই। আপনি জানেন আপনি কী হারাইতেছেন।"

কলিন আমার রসিকতা উপেক্ষা করে আপন মনে বলে চলল, "না দেখার সুবিধে এই যে তোমার ইচ্ছানুযায়ী যাকে খুশি কল্পনা করে তার সঙ্গসুখ উপভোগ করতে পারো। আমি তো দিনের বেলায় চোখ খুলিনে ; চোখ খুলি অন্ধকারে, যখন কিছু দেখা যায় না!"

"বিধাতার দেওয়া চোখ-জোড়ার এটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার নয় নিশ্চয়ই।"

"বোধ হয় না। কিন্তু বিধাতার দেওয়া কল্পনাশক্তির এটা শ্রেষ্ঠ ব্যবহার হতে পারে। সাধারণ ছেড়ে বিশেষের কথা বলি। আমার কথা ভাবো। চোখ দু'টো দিয়ে এমনিতেই ভালো

দেখতে পাইনে। তাছাড়া যাকে দেখতে চাই তাকে তো চোখ দিয়ে দেখবার আর উপায় নেই।”

ভাবলেম বৃদ্ধ বুঝি ঈশ্বরের কথা বলছে, বললেম, “তোমাদের নিরাকারবাদের ওই অসুবিধে।”

“না, ঈশ্বরের কথা বলছিনে। বলছি নশ্বরবাদের কথা। মানুষ কত সহজে মরে যায়!” বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমি বলতে পারতেম যে মানুষ জীবনের কত কঠোরতা সত্ত্বেও মরে না। বলতে পারতেম যে আমার চোখের সামনেই এমন একজন ছিল যার পক্ষে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়া কত কম বেদনাদায়ক হোতো। কিন্তু কিছু না বলে চুপ করে রইলেম। জড়ীভূত কুয়াশারই মতো।

কলিন আপন মনে বলে চলল, “জানো, এই দার্জিলিঙের জমির প্রা্ত ইঞ্চিতে ছড়ানো আছে আমার জীবনের কোনো না কোনো স্মৃতি যা কোনো দিন ভুলতে পারব না মরে না যাওয়া পর্যন্ত। একদিন নয়, দু'দিন নয়। পঁয়ষট্টি বছর। মাঝে কয়েকবার দেশে গেছি কিন্তু সে অনেকদিন আগে। উনিশ শ' পঁচিশের পরে আর দার্জিলিং ছাড়িনি। আর কোনো জায়গা ভালই লাগে না।”

“নিজের দেশও না?”

“নিজের দেশ কাকে বলো? বিশ বছর বয়সে দেশত্যাগী হয়ে ভারতে এসেছিলেম ভাগ্যান্বেষণে। ভাগ্যকে দোষ দিতে পারিনে। জীবনকে ভোগ করেছি মত্ত নাবিকের মতো। কিন্তু ইংল্যাণ্ডকে দেশ বলে অস্বীকার করেছিলেম সেই ধোয়াটে

সকালে যেদিন ইংল্যাণ্ডের মাটি থেকে পা তুলে জাহাজে উঠলেম। নিজের দেশ ছাড়লেম, পরের দেশও নিজের করতে পারলেম না! না, দেশ বলতে আমার আর কিছু নেই! নিজের বলতে আছে শুধু ছ'ফিট জমি। সে এখানে এই দার্জিলিঙে।"

বৃদ্ধের ভাব সুচিন্তিত, তার ভাষাও সুবিন্যস্ত, কিন্তু দন্ত-শূন্যতাজনিত ধ্বনি-বিকৃতির জন্যে সহজে বোধগম্য নয়। ভাব-বাহুল্যে উচ্চারণ আরো বিকৃততর হোলো। কলিন যে কাঁদছিল তা না দেখতে পেলেও জানতে আমার বাকী ছিল না। আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেম। পরিচয়ের অগভীরতার প্রশ্ন বাদ দিলেও আমি এমন কী বলতে পারতেম যা থেকে বৃদ্ধের অশান্ত হৃদয় সামান্যতম সান্ত্বনা লাভ করতে পারতো?

টলষ্টয়ের গল্পে ছ'ফিট জমির কথা পড়েছিলেম, অতএব অনুবৃত্তিটা অজ্ঞাত ছিল না। নিতান্ত সাধারণ ভাবে, লঘুতার প্রয়াস করে বললেম, "সে ছ'ফিট জমি সকলেরই আছে। তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তুমি এখানকার এই প্রাণান্তকর শীতের হাত থেকে পালিয়ে আর কোথাও গেলে সেখানেও অতটুকু জমির অভাব হবে না। অনায়াসে মিলে যাবে।"

"আমার কথা ভাবছিলেম না। ভাবছিলেম তার কথা যার ছ'ফিট জমি এখানে এগারো বছর আগেই মিলে গেছে।" কথাগুলির মধ্যে এমন একটা অপরিমেয় বেদনা ও নৈরাশ্যের সুর ছিল যে সেগুলি আমার পাশের কলিন বলছিল, না কি কোনো কবরের তলা থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল, জানবার উপায় ছিল না।

এই শীতে আমি অভ্যস্ত নই। ভয় ছিল পাছে ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়ি। কলিনের জন্যে করবার কিছু নেই, কী হবে তার দুঃখের কথা শুনে? এমনিতে আমার নিজের মন ছিল অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। সকল কৌতূহল দমন করে বললেম, "আমি কিন্তু উঠব এবার।"

"আমিও। আমার শরীরটা যেন ভালো লাগছে না। একটু পৌঁছে দিতে পারবে আমাকে?"

না বলবার উপায় ছিল না। বৃদ্ধের হোল্ডারে আরেকটা সিগারেট পরিয়ে দিয়ে নিজে একটা পান করতে করতে বললেম, "চলো।"

অশীতিপর আর্থার কলিন অক্ষম দেহটাকে কোনোক্রমে তুলে অতি ধীর পদক্ষেপে আমার সঙ্গে পথ চলতে থাকল। তার গমনের গতিতে আমার শংকার আর সীমা রইল না। কত দূর এর বাড়ি? এত আস্তে গেলে পৌঁছোতে লাগবে কতক্ষণ? এদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। এখানকার পথ-ঘাট আমার অচেনা। তারপর আমি নিজে ফিরব কী করে আমার আবাসে?

বৃদ্ধ বলল, "বাঁ দিকে চলো। ঐ দিকে আমার বাড়ি।"

আমার যাওয়ার কথা ডান দিকে। কিন্তু বৃদ্ধের আদেশ অমান্য করব এমন সাধ্য ছিল না। পথক্রমণ সহনীয় করবার জন্যে পুরানো উপদেশের পুনরাবৃত্তি করলেম, "আমার কিন্তু মনে হয় তোমার এখন আর-কোনো জায়গায় থাকলেই ভালো।"

"আমার বাগানের ম্যানেজিঙ্ এজেণ্টরাও তাই বলেছিল।"

"তুমি এখানে চায়ের প্ল্যাণ্টার বুঝি ?"

"এখন আর নই। পনের বছর আগে ছাড়িয়ে দিয়েছে। তখনও আমি অত্যন্ত কর্মক্ষম ছিলেম। তবু কলকাতার কর্তারা ছাড়িয়ে দিল নানান্ বাজে অজুহাতে। আসল কারণটা অবিশ্যি কাউকে বলবার উপায় নেই।"

অর্থাৎ, তুমি জিজ্ঞাসা করলে তোমায় বলতে পারি কানে কানে।

"তোমার মতো অভিজ্ঞ লোককে বাজে কারণে ছাড়িয়ে দেওয়া তো ওদের ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচায়ক নয়।"

"অভিজ্ঞতার প্রশ্নটাই অবান্তর হয়ে গিয়েছিল। আমার অপরাধ ছিল আরো মারাত্মক।"

কলিন ওই পর্যন্ত বলে থামল। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলেম যে আমার দিক থেকে আরেকটু জিজ্ঞাসার উৎসাহ পেলেই বৃদ্ধের কাহিনীর অবশিষ্টাংশ সবিস্তারে উদ্‌ঘাটিত হবে। একটু হেসে বললেম, "অপরাধ আবার কী ?"

"বললে বিশ্বাস করবে না। বলবে, পনেরই অগস্টের পরে বুড়ো পাপী কোট উল্টে বানিয়ে-বানিয়ে মিছে কথা বলছে। কিন্তু বিশ্বাস না করলেও কথাটা সত্যি। আমার বাগানে একটা স্ট্রাইক্ হয়েছিল মজুরি আর থাকবার জায়গা নিয়ে। হেড-কোয়ার্টার্স থেকে হুকুম এলো, বাগান বন্ধ করে দাও, কুলী-লাইন থেকে সবাইকে বের করে দাও। রেশনের দোকানে তালা দিয়ে দাও। অর্ডারস্ আর অর্ডারস্! তাই করা হোলো। উঃ, সেদিনটার কথা ভুলতে পারব না কোনো দিন! আমার

আদেশে এই নেপালী দারোয়ানরাই জোর করে বের করে দিল নেপালী কুলীগুলোকে। ভুটানী দালালরাই বন্ধ করে দিল সবগুলো মুদি দোকান। থালা বাসন, জামা-কাপড়, যা কিছু সামান্য সম্পত্তি ছিল ওদের সব ছুঁড়ে ফেলে দিল আবর্জনার মতো। এতগুলি লোকের এতখানি কষ্ট আর দেখিনি আগে। আর ছিল তিনটি মেয়ে। সেদিন ছিল তাদের প্রসবের দিন।”

উত্তেজিত কণ্ঠে এত কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। একটু থামল। আমি আরেকটা সিগারেট দিয়ে বললেম, “তুমি তো ওদের হুকুম ঠিকই মেনেছ। তোমার আবার অপরাধ হোলো কোথায়?”

“তবু হোলো। সে রাত্রে আমার স্ত্রী সেই মেয়ে তিনটিকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলো। তাদের সেবা করল নিজ হাতে, রাত জেগে। সাত দিন ধরে চলল অক্লান্ত সেবা। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, কোন দিকে হুঁশ নেই। সেবাব্রতা নোরার সেই চেহারা আজও চোখের সামনে ভাসছে।”

একটু থেমে বললে, “এই সেবার খবরটা কলকাতার বড় কর্তাদের কানে উঠেছিল। তার দিন পনের পরেই বরখাস্তের চিঠি এলো। বলল, পেন্সন্ পাবে, দেশে যাওয়ার ভাড়া পাবে, এক্ষুণি দার্জিলিং ছাড়তে হবে।”

বৃদ্ধের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। পথ আর কতটা বাকী ছিল জানি না, কিন্তু তার চলবার শক্তি যে শেষ হয়ে আসছিল তাতে আর সন্দেহ ছিল না। আর্থার কলিন তার অবসন্ন হাতটা

আমার স্কন্ধে স্থাপন করে তার উপর ভর করল। এই ভরের তার একান্ত প্রয়োজন ছিল। আমি সাধ্য মতো বৃদ্ধকে বয়ে নিয়ে চলতে থাকলেম শামুকের গতিতে।

কিছুক্ষণ পরে বললেম, "তখন পেন্সন্ নিয়ে চলে গেলেই পারতে।"

"ইচ্ছেও ছিল না, উপায়ও ছিল না। আগেও বলেছি, দেশের পাট চুকিয়ে দিয়েছিলেম বহু দিন আগেই। ও-দেশকে আর নিজের দেশ বলে মনেই হোতো না। শেষের দিকে যত বার গেছি, ভালো লাগেনি মোটে। জন্মভূমি থেকে আমার স্বেচ্ছা-নির্বাসনটা কেবল দৈহিক হয়নি, মানসিকও। তার উপর তখন সেই অমানুষিক সেবার পরেই নোরা নিজে পড়ল অসুখে।"

হঠাৎ পথের কিছু-একটায় হোঁচট খেয়ে কলিন পড়ে যাচ্ছিল। অন্ধকারে কিছু দেখবার উপায় ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে ধরে বৃদ্ধের পতন নিবারণ করলেম। তার সশব্দ নিঃশ্বাসের অবিশ্বাস্য দ্রুততা থেকে এতটুকু সন্দেহ রইল না যে এই স্থবিরের মৃদুতম পদস্খলনও পতন ও মূর্চ্ছা হবে না, হবে পতন ও অনিবার্য মৃত্যু!

আবার পথ চলতে থাকলেম। একবার উঁচু, একবার নীচু। কিন্তু পথটার যেন শেষ নেই। আমাদের গতির মন্থরতায় পথ দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকল। কলিনের অবস্থার এমন সান্নিধ্যে থেকে আমার নিজের বাড়ি ফেরবার কথা চিন্তা করবার সময় ছিল না।

কিছু দূর যাওয়ার পরে, বৃদ্ধ আবার কথা বলবার সামর্থ্য লাভ করল। অসুস্থা পত্নীর কাহিনীর সূত্রটি তুলে নিয়ে বলল, "নোরার কী যে অসুখ করল আজো জানিনে। আর অসুখের ডাক্তারী নামটা জানলেই কি, না জানলেই কি। যে যাবার সে ঠিক গেলই।"

কলিন কাঁদছিল। শিশুর মতো। অসহায় পথ হারিয়ে যাওয়া শিশুর মতো।

আমি কলিনের কেউ নই। তার সঙ্গে আমার পরিচয় পূরো একটা বেলারও নয়। আমি দেশপ্রেমিক ভারতীয়, আর কলিন আমার গতকল্যকার শাসক-জাতির অংশ। তার সঙ্গে আমার স্বাভাবিক সম্বন্ধ অবিমিশ্র সৌহার্দ-সমন্বিত হওয়ার কথা নয়। কলিন আর আমার বয়সের ব্যবধানও দুস্তর। কিন্তু যে লোকটি একেবারে অসহায় ভাবে আমার কাঁধে ভর করে পথ চলছিল, এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে বিদেশী বলে মনে করতে পারলেম না। পঁচাশি বছরের ভূতপূর্ব প্ল্যাণ্টার আর্থার কলিনকে মনে হোলো একান্ত আপন জন বলে সখা বলে, বন্ধু বলে। তার দুঃখ আমার দুঃখ হোলো।

অশ্রু মুছে কলিন বলল, "নোরা এই দার্জিলিংকে ভালোবাসত প্রাণ ভরে। এক দিনের জন্যে আর কোথাও গেলে হাঁপিয়ে উঠত। দার্জিলিঙের প্রত্যেকটা ঘাসের সঙ্গে তার ছিল নিবিড় পরিচয়, প্রতিটি ধূলি-কণার সঙ্গে ছিল হৃদয়ের যোগাযোগ। নোরা মরে গেছে বলেই কি তার সকল সম্পর্কের শেষ হয়ে গেছে ওই মেঘগুলোর সঙ্গে, ওই দেবদারু

গাছটার সঙ্গে ? কিছুতেই মানব না অমন কথা। কিছুতেই বিশ্বাস করব না যে মৃত্যুর মতো একটা সামান্য ঘটনা সব কিছু ধুয়ে-মুছে শেষ করে দিতে পারে। নোরা মরেনি। সে বেঁচে আছে এখানে, এই দার্জিলিঙে। তাই আমিও বাকী ক'টা দিনের জন্যে পড়ে আছি এই দার্জিলিঙে। প্রাণপণে নোরার স্মৃতি আঁকড়ে।

বৃদ্ধ-কথিত 'দিন কটা' যে নিতান্তই স্বল্পসংখ্যক হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তবু বললেম, "যে চলে গেছে, সে তো গেছেই। তুমি তবু এই শত সহস্র স্মৃতির হাত থেকে পালিয়ে গেলে হয়তো বা ভুলতে পেরে একটু শান্তি পেতে।"

"নোরাকে ভুলব ? নোরাকে ভুলে শান্তি পাবো ? অমন শান্তি চাইনি তো! নোরার স্মৃতি ভুলে স্বর্গসুখও চাইনে। নোরার মৃত্যুর কথা চিন্তা করে যে ব্যথা পাই, আমার জীবনে এমন কোনো আনন্দ নেই যা সেই ব্যথার তুলনায় লোভনীয়। সেই ব্যথাই আমার ভালো। সেই ব্যথাই আমার ভালো।"

আর বলবার শক্তি ছিল না বৃদ্ধের। প্রয়োজনও ছিল না।

আমিই বা কী বলতে পরতেম ? যে লোক ভুলতে চায় না তাকে মন-ভোলানো সান্ত্বনার কথা শুনিয়ে লাভ কী ?

পথ আর বেশি বাকী ছিল না। দাজিলিঙের অন্যান্য বহু বাড়ির মতো সাধারণ একটি দোতলা বাড়ির সামনে পৌঁছোতে বৃদ্ধ ইঙ্গিতে জানাল এটাই তার বাড়ি। প্রবেশ-পথ এবং সিঁড়িটা ছিল একেবারে অন্ধকার। প্রতি পদক্ষেপ অনুভব

করতে করতে কলিনকে নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেম। কাঠের সিঁড়িগুলিতে আমাদের দু'জনের আরোহণের শব্দ মৃত্যুর পদধ্বনির মতো ভয়াবহ হয়ে আমার কানে বাজছিল। সিঁড়ি বাওয়া বৃদ্ধের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হোলো। সে আমার কাঁধের উপর আরো জোর দিয়ে ভর করল।

শববহনে আমার অভিজ্ঞতা নেই। জানিনে মৃত্যুর পরে মানুষের ওজন বাড়ে কি কমে। কিন্তু আর্থার কলিনের বয়োভারাক্রান্ত দেহটাকে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে বহন করে যখন উপরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেম তখন আর আমার কোনো কিছু করার মতো দেহের বা মনের অবস্থা ছিল না। "গুড নাইট" বলে বৃদ্ধ দুর্বল হস্তে দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হওয়া মাত্র আমি আবার সেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকলেম।

সর্বনিম্ন সিঁড়িটায় পদার্পণ করা মাত্র হঠাৎ উপর থেকে কানে এলো একটা অদ্ভুত শব্দ। কারো পড়ে যাওয়ার শব্দ যেন।

কিছুতেই সাহস পেলেম না উপরে উঠে গিয়ে দেখতে যে কী হয়েছে। আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে ত্রস্তপদে ওই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে পড়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলেম সর্বগ্রাসী অন্ধকারের মৃত্যুশীতল সায়রে।

পাঁচ

একমাত্র মাদ্রাজীরা ছাড়া আমরা ভারতীয়রা সাধারণত আম্মাদের নামের মধ্যে আদি নিবাসের বিশদ বিবরণ বহন করে বেড়াইনে। কিন্তু তবু, অস্পষ্ট একটা আঞ্চলিক পরিচয় অদৃশ্য-ভাবে কোথায় যেন লেখা থাকে।

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐক্য নিয়ে আজ থীসিস্ রচনা করা নিরর্থক। ইংরেজের সহায়তায় কায়েদ-ই-আজম সে-প্রশ্নের যে নৃশংস মীমাংসা করেছেন তা আমরা সানন্দে না হলেও সম্পূর্ণভাবে শিরোধার্য করে নিয়েছি। আজ আমাকে তাই দার্জিলিং আসতে হলে বিদেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান পার হয়ে আসতে হয়। কিন্তু, কই, সারা পথে এমন তো একজনকেও দেখতে পেলেম না যাকে দেখেই মনে হয় যে ইনি নিঃসন্দেহে অভারতীয় এবং বিশুদ্ধ পাকিস্তানী!

রাজনীতিক ঘোষণা দ্বারা নতুন নিশান করা যায়, করা যায় নতুন নিশানা। মানচিত্রের চেহারা বদলানো যায় কালির দাগ মুছে দিয়ে রক্তের দাগ কেটে। কিন্তু আকৃতিগত পরিচয়ের পরিপূর্ণ পরিবর্তন সাধন ঠিক এতটা সহজসাধ্য নয়। আদৌ সম্ভব কি না তাও সন্দেহসাপেক্ষ।

চৌদ্দই অগস্ট যে দুই ব্যক্তি রহিমতুল্লা ও কৃষ্ণ মেনন বলে পরিচিত ছিলেন, হঠাৎ পনেরই অগস্ট প্রভাতে তাঁরা যখন

তাঁদের প্রতিবেশীকে গিয়ে বললেন যে তাঁরা দু'টি বিভিন্ন জাতির লোক, সুপ্তোত্থিত প্রতিবেশী তখন নিশ্চয়ই এটাকে বৃহৎ একটা পরিহাস মনে করে তাঁর ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন, তারিখটা সত্যি পনেরই অগস্ট না পহেলা এপ্রিল।

শুধু দেশের নয়, প্রদেশেরও একটা পরিচয় প্রত্যক্ষ থাকে আমাদের প্রত্যেকের আকৃতিতে। দীনেশ সরখেলকে দীন্‌শ' সাক্‌লাৎওয়ালা বলে ভুল করবার আশংকা নিতান্তই অল্প, মুখ না খুললেও। আনন শ্মশ্রুমুক্ত হলেও যোধরাজ সিংকে ভ্রম হয় না সুন্দরম্‌ রঙ্গস্বামী বলে। এ প্রসঙ্গে সভয়ে ও সসম্ভ্রমে এ কথারও উল্লেখ করব যে সম্প্রতি যে বঙ্গললনাগণ অঙ্গে সালোয়ার-পায়জামা ধারণ করে প্রাদেশিক পরিচয়ের অবলোপ সাধনে সচেষ্ট হয়েছেন, আমি অন্তত কখনোই তাঁদের কাউকে রাজপুত রমণী ভেবে বিভ্রান্ত হইনি।

যেমন মানুষের বেলায়, তেমনি জায়গার। তারও ভৌগোলিক পরিচয় একমাত্র রেলওয়ে স্টেশনের সাইনবোর্ডেই লিপিবদ্ধ থাকে না; ছড়ানো থাকে তার মাটিতে, জলে আর হাওয়ায়। বোলপুর স্টেশনে অবতরণ করলে কাউকে বলে দিতে হয় না যে জায়গাটা সাঁওতাল পরগণার, চব্বিশ পরগণার নয়। হরিণাভির রাস্তায় দাঁড়িয়ে অন্ধজনও জানে যে সে হরিদ্বারে নেই। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'—এ কথা প্রায় প্রত্যেক দেশ সম্বন্ধেই বলা যায়, কেননা প্রত্যেক দেশেরই আছে নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য। বাঙলার শ্যামলতা যেমন একান্তই বাঙলার।

এই সাধারণ নিয়মের বৃহৎ ব্যতিক্রম হচ্ছে দার্জিলিং। বাঙলা কেন, সারা ভারতবর্ষেই দ্বিতীয় দার্জিলিং নেই। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই মনোরম শৈলাবাসে এসে তাই একবারও মনে এই সন্দেহ জাগে না যে স্থানটি পশ্চিমবঙ্গ নামক প্রদেশের অংশ। জায়গাটার আর যাই থাক, বাঙালীত্ব নেই কোথাও। দার্জিলিং একমাত্র আমলাতান্ত্রিক বিচারেই বাঙলা দেশের অন্তর্ভুক্ত, আসলে সে শাংরিলার শাখা।

বস্তুত বর্তমান দার্জিলিঙের উদ্ভবই সম্ভব হয়েছে তার অবাঙালীত্বের কল্যাণে। এ যেন অতি ফর্সা এক বাঙালী মেয়ে, বিদেশী যাকে বিদেশিনী ভেবে ভুল করে প্রেমে পড়েছে। তারপর ভুল ভাঙলেও মোহ ভাঙেনি, চেষ্টা করেছে পিগম্যালি-য়নের মতো আপন স্বপ্নকে রূপ দিতে, প্রাণ দিতে।

আশা করি এ-কথা স্বীকার করলে দেশদ্রোহিতা হবে না যে আজকের দার্জিলিং বিলাসী ইংরেজদের কল্পনা দিয়ে রচা। তারা এই স্থানটিকে গড়তে চেয়েছিল স্বদেশের প্রতিবিম্ব করে। দূর দেশে নির্বাসিত স্বামী যেমন প্রোষিতভর্তৃকা পত্নীর প্রতি-কৃতি কাছে রেখে বিরহকাতর হৃদয়কে শান্ত করে।

প্রাগবৃটিশ দার্জিলিঙের ইতিহাসের অধিকাংশই অতীতের অজ্ঞেয়তায় লুপ্ত। বাকীটা হয় ঐতিহাসিকদের পাণ্ডিত্যে আবৃত, নয়তো ইংরেজের লেখা অপ-ইতিহাসে বিকৃত। বহুদূর-বিস্তৃত সিকিম রাজ্যের এই অনুর্বর অংশটি ছিল একেবারেই অবহেলিত। স্বল্পসংখ্যক লোক বাস করতো গভীর অরণ্যের

অনিচ্ছাদত্ত অনুমতি নিয়ে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জন্তু-সম্প্রদায়ের অবাধ আধিপত্য বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে—আজকের হিন্দু যেমন পূর্ববঙ্গে। তারা ছিল, তারা নেই—ইতিহাস তাদের মনে রাখেনি।

দুরন্ততম সন্তানের জন্যে যেমন মায়ের স্নেহ থাকে সব চেয়ে বেশি, ইতিহাসের তেমনি পক্ষপাতিত্ব আছে রক্তলোলুপ হিংস্রদের জন্যে। তার পাতায় তাই রামদাসের জন্যে যদি থাকে চার লাইন, শিবাজীর জন্যে আছে চার পাতা। ইতিহাসের বিচারে কালিদাসের জন্যে এক লাইনই যথেষ্ট, বিক্রমাদিত্যের জন্যে চাই পুরো একটা অধ্যায়। ইতিহাসের পাতায় নামাঙ্কন করতে হয় শোণিতাক্ষরে, তার বক্ষ ব্যেপে তাই অবাধে বিচরণ করে নেপোলিয়ন আর বিসমার্ক আর ক্লাইভের দল। স্থানাভাব ঘটে শেলী, শিলার আর কবীরের বেলায়। বিদ্বান আর যেখানেই পূজ্যতে হোক, ইতিহাসে নয়। রাজা ও রাজনীতিকদের সেখানে অপ্রতিহত একাধিপত্য!

যেমন চরিত্রের বেলায়, তেমনি ঘটনার। সেখানেও ইতিহাস সুকৃতির মান মেনে চলে না। নীতিপালনের উল্লেখ থাকে সংক্ষিপ্ততম, অন্তহীন বিস্তৃতি আছে লঙ্ঘনের জন্যে। পাতার পর পাতা জুড়ে আছে রাজ্যজয়ের ইতিহাস, লেখা নেই কোনো রোগবিজয়ের সবিস্তার কাহিনী। দেশে দেশে বা জাতিতে জাতিতে যখন মৈত্রী ও সম্প্রীতি থাকে তখন ইতিহাস তাকে উপেক্ষা করে। ব্যাখ্যান সুরু হয় বিরোধ বাধলে।

ইতিহাসে তাই দার্জিলিঙের আবির্ভাব বিরোধকেই কেন্দ্র করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভুটানীরা সিকিম রাজ্যের যে-অংশটা দখল করে নিল আজ তা কালিম্পং নামে পরিচিত। তার পরে এলো গুর্খারা। নেপাল অধিকার করে আক্রমণ করল সিকিম, ১৭৮০ খৃস্টাব্দে। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে চলল ছোটো-বড়ো নানা আকারের খণ্ডযুদ্ধ। সিকিমের সাধ্য ছিল না গুর্খাদের উন্নততর যুদ্ধ-পদ্ধতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার। তিস্তা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তারা পদানত করল সমগ্র তেরাই ভূমি। নেপাল রাজ্যের পরিধিই শুধু প্রসারিত হোলো না, প্রতিপত্তিও।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বয়স তখন বছর পনের। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা ভারতের বৃহৎ অংশেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এবার প্রয়োজন বিস্তৃতির। য়ুরোপের প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রায় সবাই একে একে রণক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ অন্তর্দ্বন্দ্ব সকল প্রতিরোধকে অক্ষম করেছে অনেক দিনের জন্য। সম্মুখে অগ্রগতির পথ অন্তহীন এবং প্রায় বাধাহীন।

কিন্তু উত্তরপূর্ব দিগন্তে দেখা দিল অপ্রত্যাশিত কালো মেঘের আভাস। নেপালের শক্তিবৃদ্ধি। কোম্পানির হস্তক্ষেপের সমর্থনে অজুহাত উদ্ভাবনে অযথা কালক্ষয় হয়নি। আহা, সিকিমের এমন বিপদের সময় ইংরেজ কি পারে নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে? বিধিনির্ধারিত কর্তব্য কি নেই ইংরেজের? সিকিমের স্বাধীনতা হরণ করতে চায় নেপাল? ইংরেজ থাকতে

এমন ঘটনা হতেই পারে না। পরের স্বাধীনতা হরণ যে ইংরেজের জন্মগত অধিকার। সে অধিকারে আর কারো হস্তক্ষেপ অক্ষমণীয়।

তাই যুদ্ধ ঘোষিত হোলো স্বাধীনতার শত্রু নেপালীদের বিরুদ্ধে। সে সকল যুদ্ধের সঙ্গে আজকের যুদ্ধের সাদৃশ্য সামান্য। মানবের উদ্ভাবনী শক্তি তখনো এমন পরিপূর্ণভাবে ধ্বংসের সেবায় আত্মনিয়োগ করেনি। সে-যুদ্ধের প্রকৃতি এমন ভীষণা ছিল না, ক্ষেত্র ছিল না বিশ্ববিস্তৃত। কিন্তু আজ যেমন প্রত্যেকটা যুদ্ধের জন্যে নতুন নতুন নাম আবিষ্কার করতে না পেরে বলি বিশ্বযুদ্ধ এক বা বিশ্বযুদ্ধ দুই, তেমনি নেপাল যুদ্ধগুলিরও নম্বর দেওয়া আছে ইতিহাসের বইয়ে। এক দুই তিন। সেই যুদ্ধের অন্তত একজন বীরের স্মৃতির উদ্দেশে কলকাতায় আজো আছে আকাশ-ছোঁয়া এক স্তম্ভ— অক্টরলোনি মন্যুমেণ্ট।

ইংরেজ অপরের স্বাধীনতা সত্যি রক্ষা করে, কিন্তু বিনামূল্যে নয়। মূল্যটা সাধারণত বড়োই উচ্চমূল্য, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে-মূল্য দিতে হয় রক্ষিত স্বাধীনতাকেই সমর্পণ করে। সিকিমের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হোলো না। তিতালিয়া-য় স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রে নেপালীরা সিকিম থেকে নেওয়া সমগ্র তেরাইভূমি ফিরিয়ে দিল, কিন্তু সবটা সিকিমের হাতে পৌঁছোলো না। সলিসিটরের আদায়ীকৃত অর্থের কতটুকু বাকী থাকে তার পাওনা মিটিয়ে দেবার পরে ?

মেচি থেকে তিস্তা পর্যন্ত জায়গাটা কোম্পানি সিকিমকে

ফিরিয়ে দিল বটে, কিন্তু বিনা সর্তে নয়। নেপাল আর ভুটানের মধ্যে অবস্থান করে সিকিম হোলো ইংরেজিতে যাকে বলে বাফার ষ্টেট : কোম্পানি রইল সে-রাষ্ট্রের স্বাধীনতার রক্ষক, কোম্পানি গ্যারান্টি করল সিকিমের সভরেন্‌টি ! ইংরেজের অধীন থাকা যে পূর্ণ স্বাধীনতারই নামান্তর কোম্পানির সাহেবের মনে সে সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। সেই পূর্ণ স্বাধীনতায় একটু যা কিন্তু ছিল তা শুধু এই যে প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে সিকিমের যদি বিরোধ বাধে তাহোলে কোম্পানিকে ডাকতে হবে মধ্যস্থতার জন্যে। আর কিছু নয়, শুধু পরোপকার !

বিরোধের জন্যে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয় নি ইংরেজকে। নেপাল-সিকিম সীমান্তে এমনি এক বিরোধ মেটাবার জন্যে মহামান্য গবর্ণর জেনারেল প্রেরণ করলেন দু'টি বিশ্বস্ত অফিসার—ক্যাপ্টেন লয়েড এবং মিষ্টার গ্রান্ট। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লয়েড ছ'দিন কাটিয়েছিলেন "in the Old Goorkha Station of Darjeeling." তিনি এলেন, তিনি দেখলেন, দার্জিলিং তাঁর চিত্ত জয় করল। একশ' উনিশ বছর পরে যেমন করেছে আমার।

মিষ্টার গ্রান্ট তদনুযায়ী রিপোর্ট করলেন গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিংকের সমীপে। বললেন, রণক্লান্ত সৈনিক ও শাসন-শ্রান্ত কর্মীদের স্যানিটরিয়মের জন্যে এমন উপযোগী স্থান আর নেই। কেবলমাত্র অবসর-বিনোদনের জন্যেই নয়, সামরিক কারণেও দার্জিলিঙের প্রয়োজন ছিল। নেপালের উপর

প্রহরিতার জন্যে। ক্যাপ্টেন হার্বার্ট ও মিষ্টার গ্রান্টের পরিদর্শনের পরে দার্জিলিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হোলো। কোম্পানির ডিরেক্টররা সে-সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলেন। আর যা বাকী রইল তাকে বলে ফর্ম্যালিটি।

১৮৩৫-এর পয়লা ফেব্রুয়ারী সিকিমের রাজা যে দানপত্রে স্বাক্ষর করলেন তাতে লেখা রইল ঃ

"The Governor General, having expressed his desire for possession of the hill of Darjeeling on account of its cool climate, for the purpose of enabling the servants of his Government, suffering from sickness, to avail themselves of its advantages, I, the Sikimputtee Rajah, out of friendship for the said Governor General, hereby present Darjeeling to the East India Company, that is, all the land South of the Great Rangit river, East of the Balasun, Kahail and Little Rangit rivers and West of Rungnu and Mahanadi river."

সিকিমের রাজার সঙ্গে জেনারেল লয়েডের কী আলোচনা হয়েছিল জানিনে। সে-আলোচনার ফলে কী অবস্থায় রাজাকে ইংরেজের হাতে দার্জিলিং সমর্পণ করতে হয় তারও বিশদ কোনো বিবরণের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই। অন্তত কাগজেপত্রে লেখা রইল যে ইংরেজ দার্জিলিং হরণ করেনি, উপহার পেয়েছে।

উপহার-প্রাপ্তির চার বছর পরে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডক্টর ক্যাম্পবেলকে দার্জিলিঙের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পদে নিয়োগ করা হোলো এবং তখন থেকেই সুরু হোলো দার্জিলিঙের উন্নতি। দশ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা একশ' থেকে দশ হাজার হোলো। ১৮৫২ সালে এক জন সরকারী পরিদর্শক লিখলেন, "দার্জিলিঙের যা কিছু উন্নতি হয়েছে তার সবটুকুর জন্য সকল কৃতিত্ব ডক্টর ক্যাম্পবেলের প্রাপ্য। দুরধিগম্য অরণ্যভূমিকে তিনি পরিণত করেছেন অপরূপ শৈলাবাসে; আবাসের অযোগ্য পার্বত্য উপত্যকা থেকে সৃষ্টি করেছেন অনুপম ভূস্বর্গ।"

নির্মল, উজ্জ্বল, প্রাণদায়ী রৌদ্রে উদ্ভাসিত ম্যালে উপবেশন করে ডক্টর ক্যাম্পবেল ও তাঁর স্বজাতির সকল দুষ্কৃতি ক্ষমা করলেম সানন্দ চিত্তে।

অর্থনীতির ভাষায় যাকে স্ক্যায়াসিটি ভ্যালু্য বলে—দুষ্প্রাপ্য-তার মূল্য—দার্জিলিঙে রৌদ্রের তা আছে। বিশেষ করে জানুয়ারীর শেষে। সেই দুর্লভ রৌদ্র যখন আবির্ভূত হয় তখন ঘরে থাকে না কেউ। উন্মত্ত সবাই ছুটে আসে আকাশের উন্মুক্ততায়; প্রাণ ভরে, দেহ ভরে রোদ পোহাতে। ম্যালে তাই আজ বেশ ভীড়, অর্থাৎ অন্তত জন কুড়ি লোক বিভিন্ন বেঞ্চিতে বসে প্রার্থনা করছে যেন রোদটা একটু দীর্ঘস্থায়ী হয়। পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, কিন্তু সাদা চোখে দূরত্বটা এত বেশি মনে হয় না। এমন অপরূপ প্রভাতে সব কিছুকে কাছে মনে হয়—কাঞ্চনজঙ্ঘাকে, ঐ বেঞ্চির ঐ

ভুটানীগুলিকে, পরের বেঞ্চির ঐ ইংরেজকে, তার পাশের ঐ অবাঙালী কিশোরকে।

রৌদ্রের স্বচ্ছতায় অপরিচয়ের ব্যবধান সাময়িক ভাবে অপসারিত হয়। একজন আরেকজনকে ডেকে বলে, "Glorious sunshine, isn't it?" অপর জন প্রশ্নের ছদ্মবেশে সানন্দ সমর্থন জানায়, "Isn't it?"

ইংরেজ ভদ্রলোক আলাপটাকে আরো একটু প্রসারিত করে বললেন, "এমন সুন্দর রৌদ্র যে হাতের কাজ ফেলে বেরিয়ে পড়েছি। জলে আর মাটিতে হাত দু'টো প্রায় জমে গিয়েছিল!"

"জল আর মাটি কেন?"

"ওই আমার রুটি আর মাখন। আমি ভাস্কর।"

আর কৌতুহল দমন করতে পারলেম না, বললেম, "কার মূর্তি গড়ছেন এখানে?"

ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে হাসলেন, "দাঁড়ান, তাঁর নামটা লেখা আছে আমার ডায়েরিতে। ঠিক ভাবে কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারিনে।"

ডায়েরিতে নামটা পড়লেম, ভানু ভক্ত।

ক্রমে জানলেম যে ভানু ভক্ত নেপালীদের সব চেয়ে বড়ো কবি। তাঁর ভক্তিরসাত্মক কাব্য নেপালীদের শুধু আনন্দই দেয় না, প্রেরণাও। তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত হচ্ছে আবক্ষ মর্মরমূর্তি যা স্থাপিত হবে ম্যালে। ভাস্কর, তাঁর নাম টমসন্, বললেন, "আমার ইচ্ছে ছিল পূর্ণাবয়ব মূর্তি গড়বার।

কিন্তু অত খরচা করবার সামর্থ্য নেই এখানকার কর্তাদের। তাই অল্পেই তুষ্ট থাকতে হবে।”

ভাস্কর টমসনের সঙ্গে আলাপ করতে অত্যন্ত ভালো লাগছিল। ভদ্রলোক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন না করে অনেক কথা বলতে পারেন। অনেক দেশ ঘুরেছেন, জানেন অনেক কিছু। বললেন আমেরিকার কথা, অষ্ট্রেলিয়ার কথা। বললেন, “আমার কাঁধে একটা ভূত আছে যে কোথাওই বেশি দিনের জন্যে একটা জায়গায় থাকতে দেয় না। কিছু দিন পরেই বলে, আবার ঝুলি কাঁধে তোলো, চলো আর কোথাও।”

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, “ভারতে কত দিন থেকে আছেন?”

“অনেক দিন। প্রায় তিন বছর হতে চলল।”

“অনেক মূর্তি গড়েছেন তাহোলে এই তিন বছরে?”

“না, খুব কম। যে-ভূতটা আমাকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত টেনে নিয়ে বেড়ায় সেই ভূতটাই মাঝে মাঝে মনটাকে বিষিয়ে দেয় বাটালী আর হাতুড়ির বিরুদ্ধে। তখন মূর্তি রেখে আর কিছু করি।”

“যথা?”

“এই তো, গত বছর এমন সময় ছিলেম সীমান্ত প্রদেশে। একটা হাসপাতালে কাজ করছিলেম।”

বিস্মিত হলেম। ভদ্রলোকের চেহারায়ই যেন কী রকম একটা ভাব ছিল যা সচরাচর এ দেশে নিরাপদ প্রাচুর্যে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজদের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁর ফরাসী ধরণের হ্রস্ব শ্মশ্রু ও উদাসী দৃষ্টি থেকেই সন্দেহ হয় যে ইনি শিল্পী। বেশ

পরিচ্ছন্ন কিন্তু এককত্বের ছাপ নির্ভুল। ওভারকোটের একটা বোতাম ছিঁড়ে গেছে, সেখানে একটা সেফটি পিন্ ঝুলছে। দেখলেই মনে হয় ইনি মুক্ত, কোনো নির্দিষ্ট ঘাটে বাঁধা নেই এঁর জীবনের তরী। পথে বেরিয়েছেন কিসের সন্ধানে কে জানে! হয়তো কিছুর সন্ধানেই নয়। হয়তো আমারই মতো; বাইরের আকর্ষণে ততটা নয়, যতটা সংসারের বিকর্ষণে।

কিন্তু এ সমস্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার উপায় ছিল না। বললেম, "হাসপাতালের কাজের পরে এই মূর্তি গড়বার অর্ডার পেয়ে দার্জিলিং এসেছেন বুঝি?"

"না, না, দার্জিলিং এসেছি অনেক দিন। মূর্তির কথা উঠল তো মাত্র মাস তিনেক আগে। তার আগে ওই জলাপাহাড়ে মাস্টারি করছিলেম।"

"মাস্টারি?"

"হ্যাঁ," ভদ্রলোক হেসে বললেন, "ইংরেজি পড়াতেম। এক জন মাস্টার ছুটিতে গিয়েছিল, তারই বদলি হয়ে, মাস ছয়েকের জন্য।"

দার্জিলিঙের প্রায় পাঁচ শ' ফিট উপরে জলাপাহাড়ে আছে সেন্ট পল'স্ স্কুল। স্কুলটির খ্যাতি আছে। গোড়াতে ছিল কলকাতায়, ১৮৬৪ সালে চলে আসে এখানে। ভারতশাসনরত ইংরেজদের সন্তানদের শিক্ষার জন্যেই এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা। অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, সেইটেই ছাত্রসংখ্যা সাধারণত পরিমিত রাখে। তার উপর আছে নিয়ম, যাতে শতকরা পঁচিশ জনের

বেশি ভারতীয় ছাত্র ভর্তি করা হয় না—স্কুলটির ইংরেজি চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

টমসন বললেন, "ওই যে ছেলেটি বসে আছে ও আমার ছাত্র। নাম মোহন।"

ছেলেটি কাছেই একটা পেন্সিল দিয়ে কী যেন লিখছিল। নিজের নাম শুনে আমাদের দিকে তাকিয়ে ভূতপূর্ব শিক্ষককে দেখে এগিয়ে এলো, "গুড মর্ণিং, সার, প্লেজেণ্টলি ওয়র্ম, ইজনট্ ইট্, সার?"

"ইয়েস্, কিন্তু আমাকে উঠতেই হবে। আবার কাজ সুরু করতে হবে। তুমি বসে এঁর সঙ্গে কথা বলো।" টমসন যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলেন! ভদ্রলোককে ভালো লাগল।

সব কিছু ভালো লাগছিল সেই সকালে। ভালো লাগল মোহনকে। কিশোরটি অত্যন্ত সপ্রতিভ কিন্তু দুর্বিনীত নয়। জানে কোথায় আলাপের শেষ ও বাচালতার সুরু। কৈশোরের কৌতূহল আছে, নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সে কৌতূহল স্বাস্থ্যকর। ক্রিকেটের বিশেষ উৎসাহী। চিত্তচাঞ্চল্য নেই চিত্রতারকাদের জীবনকাহিনী নিয়ে।

মোহনের পূরো নাম মোহন কৃপালনী। সিন্ধি। কন্‌গ্রেস প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে আত্মীয়তা নেই, নাম বলেই সেকথা যোগ করল। কারণটা তখনো জানিনে।

মোহনদের দোকান আছে দার্জিলিঙে। দামী কাপড়ের দোকান। এখানে আছে মাস পাঁচেক হলো। তার আগে

ব্যবসা ছিল লাহোরে। মোহন এখন শীতের ছুটিতে জলাপাহাড় থেকে এসেছে মা-বাবার কাছে। মাঝে মাঝে সে নিজেও চৌরাস্তার দোকানের তদারক করে। পরিবারে কেউই চাকরি করে না। সবারই আছে কোনো না কোনো ব্যবসা। বয়স কম হলেও মোহনের ব্যবসা-প্রীতি মজ্জাগত। চাকরিতে অভি-রুচি নেই, বলল সেকথা। কথায়, ব্যবহারে, অভিলাষে—মোহন বাঙালী সমবয়সীদের থেকে সব ব্যাপারেই বিভিন্ন।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "বলুন দেখি, পাঁচ অক্ষরের কথা যার মানে Kingdom."

বললেম, "Realm হতে পারে।" মোহন ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল্ করতে সুরু করেছে অল্প কিছু দিন হোলো। উৎসাহ অপরিসীম কিন্তু অনভিজ্ঞতার জন্যে পারদর্শিতা উল্লেখযোগ্য নয়। আমার এ-বিদ্যায় কিঞ্চিৎ অভ্যাস ছিল, তাই মোহনের সহজ ধাঁধাগুলির উত্তর দিতে কষ্ট হোলো না। মোহন মুগ্ধ-বিস্ময়ে প্রশ্ন করল, "আপনি এত সহজে করতে পারেন অথচ উত্তর পাঠান না কেন? এবার তো ফার্ষ্ট প্রাইজ কুড়ি হাজার। অনায়াসেই তো আপনি এতগুলি টাকা পেতে পারেন!"

"না, অনায়াসে নয়। এই পাজ্‌ল্‌গুলিতে অসংখ্য অলটারনেটিভ থাকে। ঠিক উত্তরটা নির্ভর করে পাজ্‌ল্‌কর্তার মর্জির উপর, যুক্তির উপর নয়। তাছাড়া প্রাইজ আছে বলেই করতে ভালো লাগে না। আমি মাঝে-মাঝে টাইম্‌সের পাজ্‌ল্ করি। সেটা অনেক ভালো।"

"কিন্তু তাতে তো প্রাইজ নেই!"

"সেইজন্যেই তো করতে ভালো লাগে।"

"বা রে, তাহলে কী লাভ করে? মিছিমিছি পরিশ্রম!"

"তুমি যে ক্রিকেট খেলো সেও তো পরিশ্রম। কী পুরস্কার তার আনন্দ ছাড়া?"

"সে আলাদা, সে তো খেলা!"

"ক্রসওয়ার্ডও তো খেলা। প্রাইজের প্রশ্ন উঠলেই খেলাটা মাটি হয়ে যায়। লাভের আশংকা থাকলেই তো সেটা ব্যবসা হয়ে গেল! তখন সেটা কাজ মনে হয়। ভালো লাগে না।"

মোহন আমার নির্বুদ্ধিতায় হতবাক্ হোলো। অর্থলাভের সুযোগ থাকলেও যা নিরর্থক তাই নিয়ে সময় নষ্ট করতে মোহন কাউকে দেখেনি এর আগে। আমার কথাকে অবিশ্বাস্য পরিহাস মনে করে বলল, "কিন্তু আমি যে ক্রসওয়ার্ড করছি সেটা করলে তো খেলা আর লাভ দুই-ই একসঙ্গে হতে পারে।"

"মনে হয় হতে পারে, কিন্তু হয় না। দু'টোর মধ্যে বিরোধ আছে। যুক্তি দিয়ে দেখতে গেলে কোনো কারণ নেই ধনী কেন ধামিক হতে পারবে না। কিন্তু হয় না। God আর Mammon-এর উপাসনা যেমন একসঙ্গে হয় না, তেমনি আনন্দ আর ব্যবসাও একসঙ্গে হয় না।"

মোহন কী বুঝল সে-ই জানে। চুপ করে রইল। আমি ভাবছিলেম নানা অসংলগ্ন ভাবনা। সমৃদ্ধি কেন সমাধি দেয় আদর্শকে? শারীরিক বিলাস কেন বিনাশ করে মানসিক সূক্ষ্মতা? কোনো কারণ নেই, কিন্তু একথা অস্বীকার করবারও

উপায় নেই যে তাই হয়। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ান থেকে সাধক হয়নি কেউ, তাকে বেছে নিতে হয়েছে কণ্টকের আসন। দারুণ গ্রীষ্মে সে সম্মুখে প্রজ্বলিত করেছে বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড, দারুণ শীতে সে সাধনা করতে গেছে হিমমণ্ডলের সর্বোচ্চ শিখরে।

মোহন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ষ্টেটস্‌ম্যান যদি নিয়ে আসি আমাকে দেখিয়ে দেবেন কী করে তার পাজ্‌ল্‌ করতে হয়?"

"সানন্দে।"

দার্জিলিঙে আসা অবধি খবরের কাগজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। ইচ্ছা করেই রাখিনি। চেয়েছিলেম নীচের সব কিছু ভুলে থাকতে। পালিয়ে এসেছিলেম সব কিছু থেকে। কিন্তু পালানো কি যায়? পালানো যায় একটা জায়গা থেকে, একটা লোক থেকে। কিন্তু নিজেরই আরেকটা অংশ থেকে নিষ্কৃতি এত সহজ নয়। শিয়ালদহ ষ্টেশনে শহুরে আমি-কে পরিত্যাগ করে এলেও পোড়াদহতে পৌঁছে দেখি, হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে অতি পুরাতন ভৃত্য। তাই নৈসর্গিক স্বর্গ উপভোগ করতে করতেও খবরের কাগজের নাম শুনলে দুর্মর কৌতূহল জাগ্রত হয়ে ওঠে নীচে ফেলে আসা জগৎটার সম্বন্ধে। জানতে ইচ্ছে হয়, কোথায় ভূমিকম্প হোলো আর কোথায় বন্যা।

ভূমিকম্প সারা পৃথিবীতে, বন্যা প্রাত মানবের চোখে। কাগজ খুলেই দেখি, মহাত্মাজী অনশন করেছেন। কলকাতার সাম্প্রদায়িকতার দাবাগ্নি নির্বাপিত করে গান্ধীজী যাত্রা করেছিলেন ঘৃণাদগ্ধ পাঞ্জাবের দিকে। তখনো জানতেন না দিল্লীর

দাঙ্গার কথা। রাজধানীতে পৌঁছে আর এগুতে পারলেন না। শিবির স্থাপিত হোলো নয়াদিল্লীতে! যুদ্ধের শিবির নয়, শান্তির শিবির। সমগ্র ভারতবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন গান্ধীজী একা, জাতীয় অবমাননার অবসান ঘটাবেন আত্মবলি দিয়ে। অগণ্য জনতার হিংস্র মত্ততাকে শান্ত করবেন আত্ম-যাতনের মধ্য দিয়ে।

সূর্য তখন মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করেছে। সবটুকু আলো নিঃশেষে মুছে গেছে। ধরণীর বুকে আবার নেমেছে কুয়াশার গাঢ় অন্ধকার। আমার কথা বলবার শক্তি ছিল না।

মোহন বলল, "ক্রসওয়ার্ড তো শেষের পাতায়। প্রথম পাতায় কী দেখছেন ?"

"আজ পারব না ভাই, আরেক দিন দেখিয়ে দেবো। এখন আর কিছু ভালো লাগছে না।"

মোহন কাগজ পড়ে। সে জানতো গান্ধীজীর অনশনের কথা! বোধ হয় ভাবল সেই আলোচনায় আমি উৎসাহী হবো। বলল, "গান্ধীব অনশনের আজ চার দিন হোলো।"

"এ-বয়সে চারদিন মানে চার বছর।"

"কী দরকার ছিল উপোস করবার তাহোলে ?"

"তা বটে!" কারো সঙ্গেই তর্ক করবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। অপরিণতমনস্ক কিশোরের সঙ্গে তো নয়ই।

মোহন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠল, "আই হোপ হী ডাইস্। বুড়োর এখন মরাই ভালো।"

মানব জাতির পঞ্চমাংশের স্বাধীনতা দেওয়ার সঙ্গে

মহাত্মাজীর কর্তব্যের অবসান হয়েছে, ভারতবর্ষকে দেবার তাঁর আর কিছু নেই, এই সকল অর্বাচীন মতবাদ এর আগেও শুনেছি। কিন্তু এতটুকু শিশুর মুখে এমন স্পষ্ট উক্তি শুনতে হবে এমন আশংকা করিনি। মহাত্মাজীর মৃত্যু কামনা এমন নির্লজ্জ ভাষায় এর আগে আর শুনিনি। বিরক্তিতে আমার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল। ক্রোধ সম্বরণ করে আস্তে আস্তে বললেম, "তোমার বয়সে সব কিছু বোঝবার কথা নয় এবং যা বোঝো না তা নিয়ে কথা না বলাই ভালো।"

"আমি না হয় বুঝিনে। আমার বাবা তো বোঝেন। তিনিও আজ সকালে এই কথাই বলেছেন। ওরা আমাদের মেরে শেষ করে দেবে আর আমরা বুঝি থাকব কাপুরুষের মতো হাত-পা গুটিয়ে ?"

মোহনের পিতৃভক্তি প্রশংসনীয়। কিন্তু তর্ক এড়াবার জন্যেই বললেম, "তোমাকে তো মারেনি, তাহোলেই হোলো।"

"আমাকে মারেনি কিন্তু আমার বোনকে মেরেছে। চার বছরের ছোটো বোন। আমার দুই ভাইকে মেরেছে। এক পিসীকে মেরেছে।" মোহন প্রায় চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, "আমার দিদিমাকে মেরেছে। আমাদের লাহোরের বাড়িতে যে ক'জন ছিল সবাইকে মেরেছে।" মোহন ঝর-ঝর করে কাঁদতে লাগল। আমি তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেম।

মোহনের ক্রোধ মিথ্যা নয়। অস্বাভাবিক নয়। এতটুকু শিশু ক্ষুদ্র হৃদয়ে এত ক্ষোভ, এত ঘৃণা, এত বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়েছে দেখে মন তিক্ত বিস্ময়ে ভরে ওঠে। কায়েদ-ই-আজম

ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ করেছেন, সেটা বৃহৎ ক্ষতি। কিন্তু তিনি এতগুলি সুস্থ মনে এতখানি ঘৃণার সঞ্চার :করেছেন, এই শিশুটির সুকুমার হৃদয়ে পর্যন্ত এতখানি হিংস্রতা সঞ্জাত করেছেন যে তাঁর এ-অপরাধের বোধ হয় ক্ষমা নেই। এ-অপরাধ তো শুধু মানবদেহকে ক্লিষ্ট করেনি, মানবাত্মাকে লাঞ্ছিত করেছে।

মোহনের অশ্রুও মিথ্যা নয় ; এবং মোহনও একা নয়। অতি সত্য তাদের সকলের দুঃখ। তাদের বেদনা অস্বীকার করিনে। কিন্তু একথাই বা অস্বীকার করি কী করে যে প্রতিহিংসায় প্রতিকার নেই ?

কলকাতার দৃষ্টান্তের কথা স্মরণে ছিল। তবু অবিশ্বাসী মন প্রশ্ন করে, একটি মানুষের প্রচেষ্টায় কি সম্ভব হবে এত দুর্বৃত্তের বক্ষ থেকে এত পাশবিকতার নিরসন ? বিশ্বাস-ঘাতকের ছুরিকা কি মানবের বিশ্বাসে বারণ ? শান্তির ললিত বাণী ।ক ব্যর্থ পরিহাসের মতো শোনাবে না ? এক পক্ষের নিষ্ক্রিয়তা কি অপর পক্ষের উৎসাহের কারণ হবে না ? গান্ধীজী একা কি পারবেন এতগুলি ক্ষুব্ধ হৃদয়ের এতখানি ক্ষোভ ঘোচাতে ? এতগুলি আঁখি থেকে এতখানি অশ্রু মোছাতে ?

সমস্ত জগৎ সেদিন শংকিত চিত্তে রুদ্ধনিশ্বাসে এই প্রশ্নেরই উত্তর প্রতীক্ষা করছিল।

ছয়

কায়িক পরিশ্রম সম্বন্ধে আমার মনোভাব স্পার্টান নয়। বরং কিছুটা চৈনিক বলতে পারি। স্বেদস্নাত কলেবরে ধনিক-দলকে টেনিস খেলতে দেখলে আমিও গল্পের সেই চীনা কুলির মতো ভাবি ঃ এদের নিশ্চয়ই বেশ পয়সা আছে, তবু কেন এমন কৃপণ এরা? অল্প কিছু পয়সা খরচ করলেই অনায়াসে কয়েকজন লোক ভাড়া করে তাদের দিয়েই খেলাতে পারে! তাই আমি শেষ যে-বল দিয়ে ফুটবল খেলেছি তা ফুটবল নয়, প্রত্যাখ্যাত টেনিস বল। শেষ যেবার ক্রিকেট খেলেছি তার ষ্টাম্প এবং বেল ছিল কয়েকখানি ইট মাত্র, উইকেট নয়। আমি স্যাণ্ডো নই, সেটা বিস্ময়কর নয়। কিন্তু যা শুনলে হয়তো স্বয়ং স্যাণ্ডোর মূর্চ্ছা ও পতন ঘটতো তা হচ্ছে এই যে স্যাণ্ডো হবার ক্ষীণতম অভিলাষও নেই আমার মনে।

।কন্তু জায়গার গুণ আছে। কলকাতায় আমি লায়ন্স রেঞ্জ থেকে জি. পি. ও. হেঁটে যেতে হলে হাঁপিয়ে উঠি। অথচ, এই দার্জিলিঙে এসে প্রতিদিন যে রবার্টসন্ রোড থেকে ম্যাল্ হয়ে বার্চহিল পর্যন্ত ধাবন করছি, একেবারে অযথা, এমন কি গল্‌ফ্ বলের সন্ধানে পর্যন্ত নয়, তাতে এতটুকু ক্লান্ত বোধ করিনে। বরং প্রফুল্ল বোধ করি। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই একটা আছে, অন্তত মনোবৈজ্ঞানিক, কিন্তু আমার তা নিয়ে

অহেতুক কৌতূহল নেই। আমি এত দূর যে হাঁটতে পারি তাইতেই নিজেকে অভিনন্দন জানিয়ে খুশি থাকি!

একাধারে তৃতীয় দিন এই অসাধ্য সাধন করে আপন পরাক্রমে চমৎকৃত হয়ে বার্চহিলে বিশ্রাম উপভোগ করছিলেম। অন্যান্য ঋতুর কথা জানিনে কিন্তু এখন, জানুয়ারীর শেষার্ধে, এই জায়গাটা একেবারেই নির্জন। প্রাণী বলতে আমি এবং শ্রীরামচন্দ্রের শতাধিক অনুচর ছাড়া আর কারো সাড়া নেই। উপরে নীচে চারদিকে ঘিরে শুধু রয়েছে নানা রকমের গাছপালা। বসু বিজ্ঞানমন্দিরের মতে তাদের নিশ্চয়ই প্রাণ আছে, কিন্তু তারা আমার সঙ্গে কথা কয় না। কইলে তারা যে-ভাষায় কথা কয় তা আমি শুনতে পাইনে। আমি না উদ্ভিদ্‌বিদ্‌, না কবি। বৃক্ষ তাই আমার কাছে বৃক্ষই, নিগূঢ় কোনো তত্ত্বের অভিব্যক্তি নয়। অনায়াসেই তাই জন্তুকে প্রাণবান মানি, কিন্তু বৃক্ষকে নয়।

সেদিন অভিনন্দনের একটা অতিরিক্ত কারণ ছিল। পদব্রজে পর্বতারোহণের চাইতেও দুঃসাহসিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেম। অশ্বারোহণ করেছিলেম। শৌর্য নিয়ে আমি সাধারণত দম্ভ করিনে কিন্তু সত্যের খাতিরে এখানে সবিনয়ে যোগ করতেই হবে যে সে-ঘোড়াটির নাম ছিল "অ্যাটম্ বম্"।

বি-এ পাশ করে টুপি মাথায় এবং বিয়ে করে টোপর মাথায় ছবি তোলার যেমন প্রায় অলংঘনীয় একটা বিধান আছে, তেমনি দার্জিলিঙে এসে ঘোড়ায় চড়ে সঙ্গীর ক্যামেরার সম্মুখীন হয়নি এমন ব্যক্তির সংখ্যা বেশি নয়। সাধারণ বাঙালীর

পক্ষে ঘোড়ায় চড়া দৈনন্দিন অভ্যাস নয়, দুর্লভ বিলাস। সেই অপরূপ দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য যাদের হয়নি তাদের সকল অবিশ্বাস ভঞ্জন করবার জন্যেই এই প্রতিকৃতির ব্যবস্থা। ক্যামেরা নাকি মিথ্যা বলে না।

আমার ছবি তোলবার মতো কেউ কোথাও ছিল না। থাকলে আমার ঘোড়ায় চড়াই হোতো না। অশ্বারোহণে আমার অপরিসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে গেলে বাহনের কাছ থেকে সে-লজ্জা গোপন করবার উপায় নেই, কিন্তু তার আরও সাক্ষী রাখব এমন দুঃসাহসী আমি নই।

ষড়যন্ত্রটা সুরু হয়েছিল আমার দার্জিলিঙে পৌঁছোবার পরের প্রথম প্রভাত থেকেই। রোজই সকালে ম্যালে এসে বসবার একটু পরেই কয়েকজন ছেলে আমায় ঘিরে ধরে বলে, "রাইডিং সাব?" সায়েব প্রতিবারই সবিনয়ে বলেছে, "নো, থ্যাংক্‌স্"। কিন্তু ওরা দমেনি। এই বালক-সহিসদের অধ্যবসায় বীমার দালালদের অনুকরণযোগ্য। একবার বারণ করে দিলেও কিছু-ক্ষণ পরে এসে বলে, "ক্লাস্ ওয়ান্ হর্স, সার, থরোব্রেড।" অশ্ব-সমাজের কৌলীন্যে আমার কৌতূহল উদ্দীপিত হয় না দেখেও ওরা নিরাশ হয় না। আবার কিছুক্ষণ পরে এসে বলে, "য়ু ভেরী গুড হর্সম্যান, সার।"

একমাত্র চক্ষু দ্বারা দর্শন ব্যতীত ঘোড়ার সঙ্গে যার আর কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই তার সম্বন্ধে এমন অসত্য অতিশয়োক্তি অশ্বকুলের বোধগম্য হলে তাদের অট্টহাস্যের কারণ হোতো।

আমিও জানতেম যে সেই বালক সহিসের স্তুতি একেবারেই মিথ্যা। কিন্তু তবু, প্রশংসা তো! তার প্রলোভন জয় করা বড়ো শক্ত। মানব-চরিত্রের বহুবিধ দুর্বলতার মধ্যে এইটেকে জয় করাই বোধ হয় সব চাইতে দুরূহ। নিন্দায় বিচলিত হয় না এমন লোক যদিবা থাকে, প্রশংসায় পুলকিত হয় না এমন কেউ নেই। সে-পুলক এমনি একটা মোহ বিস্তার করে যে তখন সকল পরিমিতিবোধের অবসান ঘটে। প্রশংসার প্ররোচনায় তখন স্বীয় প্রতিভার সীমা এবং নির্দেশ অবজ্ঞা করে গুণিজন পর্যন্ত নিজেদের নিয়োজিত করেন এমন কাজে যাতে তাঁদের দক্ষতা নেই। গায়ক দিলীপকুমার তখন উপন্যাস রচনা করেন, লেখক তারাশঙ্কর ফ্যাসি-বিরোধী বিবৃতি প্রচার করেন এবং ডাক্তার বিধান রায় রাজনীতি করেন! বিদ্যা তাতে সমৃদ্ধ হয় না, দেশও উপকৃত হয় না।

আর সব আবেদন-নিবেদন তাই উপেক্ষা করতে পেরেছিলেম। কিন্তু সহিস বালক যখন আমাকে ভেরী গুড হর্স্ম্যান আখ্যা দিল তখন লোভ আর বুদ্ধির বাধা মানল না। দেবদূতগণ যেখানে পদসম্বরণ করতেন, আমি সেখানে ঝাঁপ দিলেম। বললেম, “যাবো, কিন্তু তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে ঘোড়াকে ধরে রেখে।” ভেরি গুড হর্স্ম্যানের মুখে এমন করুণ স্বীকারোক্তি শুনে সহিস বিস্মিত হোলো না। আমার অনুরোধে রাজী হোলো। আর আমার পথ রইল না পশ্চাদপসরণের।

অচিরেই আবিষ্কার করলেম যে অন্যান্য আরো অনেক

বিপদের মতো অশ্বারোহণের ভয়াবহতাও বহুলাংশে নির্ভর করে দূরত্বের উপর। কাছে এলে দেখা যায় যে বিভীষিকা অনেকখানি মিলিয়ে গেছে, রোদ উঠলে কুয়াশার মতো। অ্যাটম বমের মতো ভীতিপ্রদ নামের অধিকারী জন্তুটি আসলে নিতান্তই নিরীহ। শীতে বেচারী আড়ষ্ট হয়ে আছে। অমন জানোয়ারের কাঁধে চাপতে মায়া হয়, অন্তত হওয়াই উচিত। কিন্তু অমন আধমরা না হলে আমার যে ঘোড়ায় চড়াই হয় না।

ভয়ে ভয়ে এবং ভয় গোপন করতে করতে ঘোড়ার পৃষ্ঠে আসীন হলেম। লাগামের কোন দিক কী ভাবে টানলে অশ্বের মস্তিষ্কে কী বার্তা বাহিত হয় তার কিছুই জানিনে। তাই লাগাম এমন ভাবে ধরে রইলেম যেন ঘোড়া জানতেই না পারে আমার কী উদ্দেশ্য। সহিস তার জিহ্বা ও চঞ্চুযুগলের সংযোগে অদ্ভুত একটা ধ্বনি করতেই ঘোড়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকল। সে গতি কোনো শামুকের মনেও ঈর্ষার উদ্রেক করতো না।

লয়েড বটানিক গার্ডেন, ম্যুজিয়ম, লেবং রেস্‌কোর্স, মনাস্টেরি, অবজার্ভেটরি ইত্যাদি নানা দর্শনীয় স্থানের উল্লেখ করে সহিস জিজ্ঞাসা করল আমি কোথায় যাবো। আমি বললেম, বার্চ হিল্।

বার্চ হিল এবং জলাপাহাড়ের অরণ্য অঞ্চল ছাড়া পুরানো দার্জিলিঙের বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নেই। এখান থেকে সমস্ত গাছপালা সমূলে ধ্বংস করে তৈরী হয়নি সুদৃশ্য বাগান বা মানুষের আবাসের জন্যে বাসস্থান। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট কর্তৃক রক্ষিত এই পার্কে তাই এখনো আছে অসংখ্য রকমারি গাছ,

আছে বহু শ্যাওলাপড়া জায়গা আর ছায়ায় ঢাকা পথ। উপরে উঠবার ও নীচে নামবার পথটা ঘোরানো, স্পাইর‍্যাল সিঁড়ির মতো। অনেকগুলি বাঁক আছে যেখান থেকে অল্প দূরে কেউ আসছে কিনা তাও দেখবার উপায় নেই। অনেকগুলি জায়গা আছে যেখানে বসে থাকলে কারও সাধ্য নেই খুঁজে বের করে। বার্চ হিল্ পলাতকের স্বর্গ।

ঘোড়ায় চড়া শেষ করে এমনি একটা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলেম। এই রকম জায়গায় আমি ভালো বোধ করি, যেখানে আমার সঙ্গী আমিই।

অপরিচিত বা অর্ধ-অপরিচিতদের মধ্যে অনেকে পারেন নিজেদের পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে। আমি পারিনে। আমি একা থাকতে পারি। পারি বিশেষ একজনের সান্নিধ্যে সময় সম্বন্ধে বিস্মৃত হতে, পারিনে অর্ধ-পরিচিতদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনান্তরিক হাসির অন্তরালে লৌকিকতার বিনিময় করতে। তাই আবার একা থাকতে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটা সিগারেট ধরালেম এবং মনে মনে আবৃত্তি করতে থাকলেম ঃ

Just—
Watch the smoke rings rise in the air.
You'll find your share
Of memories there.

এই তো হোলো বিপদ। স্মৃতি থেকে পলায়ন করতে পারিনে। ফ্রান্সিস টমসনের সেই হাউণ্ড অব্ হেভেনের মতো

স্মৃতি আমাকে অনুসরণ করছে প্রতিটি জাগ্রৎ মুহূর্ত। সকল চক্ষুর অন্তরালে দার্জিলিং বার্চ হিলের এই নিভৃততম কোণে এসেও সেই স্মৃতি থেকে নিষ্কৃতি নেই। অল্প কিছু দিন পূর্বেও যার চিন্তা ছিল অপরিসীম আনন্দের উৎস আজ তার কথা মনে হলেই হৃদয় দগ্ধ করে শুধু সেই বেদনাদায়ক স্মৃতির স্ফুলিঙ্গগুলি যারা প্রলাপে জড়ানো স্বপ্নময় মুহূর্তগুলির তুলনায় সংখ্যায় নগণ্য কিন্তু পরবর্তী তিক্ততার মধ্যে কোথায় তারা হারিয়ে গেছে! ব্যথা দিয়ে শেষে যা কয়েছিল, শুধু তাই মনে রইল। তার আগের সহস্র সুমধুর কথা কোন্ বিস্মৃতির অতলে মিলিয়ে গেল।

জোর করে মনকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলেম। পকেট থেকে পাঠ্য কিছু বের করে তাইতে নিয়োজিত করতে চাইলেম মনকে। যে বইটা বেরুলো সেটা সস্তা একটা রোমহর্ষক। অপ-সাহিত্যের এ-শাখায় আমার রুচি নেই, কিন্তু বইটা খুলতেই আত্মচিন্তাক্লিষ্ট মনটা অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেল, হাওয়া যেমন করে মেঘকে উড়িয়ে দেয়। সেদিন ঘুম ষ্টেশনে শিখা এই বইটা সেই হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে আমার হাতে পূরে দিয়েছিল। আমাকে ঠিকানা জানাবার জন্য।

সত্যি, পূরো দু'টো দিন শিখা এবং আমি একই জায়গায় রয়েছি, দু'জনের দেখা হওয়া এত সহজসাধ্য, অপর পক্ষের নিমন্ত্রণও রয়েছে, তবু দেখা করার কথা মনে হয়নি। মাত্র তিন বছর আগেও এমন অবস্থা অভাবনীয় ছিল। তখন শিখার সঙ্গে একটু দেখা করবার জন্যে কী না করতে পারতেম? কী না দিতে পারতেম?

শেষ দিন ক'টার কথাও মনে পড়ছে। বিচক্ষণা শিখা তখন মোহমুক্ত। আমাকে আর তার প্রয়োজন ছিল না। এদিকে আমি তখন দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের মতো অসহায়। উঃ, কী অসহ্য যন্ত্রণায় সেই দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। জীবনকে মনে হয়েছিল অর্থহীন, পৃথিবীকে প্রাণহীন। একমাত্র শিখার হৃদয়হীনতা আমার ভুবন থেকে সেদিন সব আলো নিঃশেষে মুছে দিয়েছিল।

আর আজ! হাসি পেল।

কিন্তু পরমুহূর্তেই কান্না পেল এই কথা ভেবে যে, আজ যার চিন্তা আমার শয়ন, জাগরণ, সমগ্র সত্তা এমন মর্মান্তিকভাবে আচ্ছন্ন করে আছে সে-ও কি একদিন এই শিখারই পর্যায়ে পর্যবসিত হবে? একদা শিখার যেথা শেষ, সেথায় তোমারও অন্ত? ভেদ নাহি লেশ? আজকের যে বেদনা সে গভীর, কিন্তু এ বেদনা যে পরম রমণীয়; এ-বেদনাতে যে পুলক লাগে গায়ে।

না ভগবান, আর যাই করো, এইটে করো না। বিয়োগান্ত নাটকের পঞ্চমাংকে নিষ্ঠুর হত্যার শাস্তি দাও আমাকে, কিন্তু প্রহসনের উপনায়ক করো না!

নাঃ, আবার সেই বিভীষিকাময়ী চিন্তাগুলি মনের মধ্যে ভীড় করছে। শিখার দেওয়া বইটা হাতে করে উঠে পড়লেম। একা থাকার এই বিপদ। যাবো কি শিখার কাছে একবার? কী জন্যে? যে-আগুন নিবে গেছে এখন তাইতে ফুঁ দিলে আগুন আর জ্বলবে না—শুধু ছাই উড়বে আর তার ধোঁয়ায় চোখে আসবে জল।

যাবো কি ?   না, যাবো না ?

মিষ্টার হাইডই শেষ পর্যন্ত স্থির করল। বার্চ হিল থেকে নামতে স্থরু করলেম।

বেশি দূর যেতে হোলো না। একটু অগ্রসর হ'তেই দূরে দেখলেম এক অশ্বারূঢ়া মহিলাকে। আমার দৃষ্টিশক্তি নিখুঁত নয়। চশমার কাঁচ পুরু, স্বাভাবিক দৃষ্টি থেকে আমি চিরতরে বঞ্চিত। দূরের জিনিস যা ঠিক ভাবে দেখতে পাই তার অর্ধেকটা চোখের কাজ, বাকিটা অনুমিতি। কিন্তু যে বীরাঙ্গনাকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখলেম তিনি যে শিখাই তাতে সন্দেহ ছিল না। ভুল করিনি।

কাছে আসতেই শিখা ঘোড়া থেকে নামল। আমি তার সপ্রতিভ, স্বাভাবিক গতিভঙ্গী দেখে মুগ্ধ হলেম। ঠিক সেই শিখাই আছে! এখন দেখলে বোঝবারও উপায় নেই বিবাহের মতো বৃহৎ একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে শিখার উপর দিয়ে। সাধারণত বাঙালী মেয়েদের বিবাহের সঙ্গেই ঘটে একটা অসম্ভব পরিবর্তন। বিবাহের পূর্বে যিনি হাস্যময়ী চঞ্চলা থাকেন, পরে তাঁকে দেখলে ক্যাথলিক নান বলে ভুল হয়। আর লজ্জাশীলা কুমারীগণ বিবাহের কিছু দিনের মধ্যে তাঁদের শিশুদের নানাবিধ শারীর প্রক্রিয়া নিয়ে এমন প্রকাশ্য আলোচনা করেন যে রুচিশীল ব্যক্তির পক্ষে শোনা দায়। শিখা কিন্তু শিখাই আছে।

শিখা নিঃশব্দে কাছের একটা গাছের গায়ে তার বাহনকে বাঁধল। আমি চুপ করে রইলেম। ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদি।

এই সমস্ত বীরত্বব্যঞ্জক কাজগুলি শিখা এমন সহজ এফিসিয়েন্সির সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে যে মনে হয় এগুলি যেন তার দৈনন্দিন কর্মবিধির অন্তর্ভুক্ত। একটি মাত্র কথাও না বলে শিখার নীরব নেতৃত্বের নির্দেশে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দু'জনে গিয়ে বসলেম একটা বিরাট গাছের তলায়। নিভৃতে বসবার পক্ষে এমন জায়গা পৃথিবীতে দুর্লভ।

শিখা জানে কী ভাবে কথা বলতে হয়। বাঙলা ছবির সংলাপ যে একেবারে অবাস্তব নয় তা একমাত্র শিখার কথা শুনলেই বিশ্বাস করা যায়। ওর ভাষায় আছে অস্পষ্ট একটা সাহিত্যিকতার আভাস। কণ্ঠে আছে ভাবগর্ভ গভীরতা। জানে কখন কী বলতে হয়। তার চেয়েও বিস্ময়কর, জানে কখন কিছু না বললেই সব চেয়ে বেশি বলা হয়।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর শিখা অন্য দিক থেকে তার উদাস দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, আমাদের গেছে যেদিন, একেবারেই কি গেছে, কিছুই কি নেই বাকি ?"

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটা আমিই একদিন শিখাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেম। একদিন সেই উদ্ধৃতিটা আমারই উপর এমনভাবে প্রয়োগ করা হবে সেদিন মনে উদয় হয়নি এমন আশংকা। বিস্ময় গোপন করে আকাঙ্ক্ষিত উত্তর দিলেম, "রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।"

"ওটা তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা।"

"তোমার প্রশ্নেরই মতো।"

"কিন্তু আমার প্রশ্নটা আমারই ছিল, ভাষাটা শুধু কবির।"

"আমার উত্তরটাও যে তাই নয় তাই বা জানলে কী করে?"

শিখা কী বলবে ভেবে পেল না। কিন্তু অসীম তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। অনায়াসেই বিস্ময় গোপন করে বলল, "কবিতাটার পরের লাইনগুলি ভুলে গেছ বোধ হয়! তোমার উত্তরের পরের লাইনেই আছে উত্তরদাতার আত্মজিজ্ঞাসা, 'খটকা লাগল, কী জানি বানিয়ে বললেম না কি!' তোমার তেমন কোনো সন্দেহ জাগেনি তো?" শিখা জানে শ্লেষকে কী করে হাসিতে ঢেকে সহনীয় করতে হয়।

"এত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হোলো কি ঝগড়া করবার জন্যে?" আমি শিখার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললেম, "ঝগড়া রেখে তার চেয়ে ভালো কথা বলো। যা বলতে তোমার ভালো লাগবে, শুনতে আমার।"

শিখা খুশি হোলো। বলল, "আচ্ছা, আমাদের সেই এক সঙ্গে কাটানো দিনগুলি তোমার মনে আছে?

"মনে থাকলেও তোমার মুখ থেকে আবার শুনতে ভালো লাগবে।"

"আমার সব চেয়ে স্পষ্ট মনে আছে সাতাশে ডিসেম্বরের সন্ধ্যাটার কথা। মনে আছে তোমার?" শিখা আরো একটু কাছে সরে এলো, "খুব শীত ছিল। তুমি তোমার গরম কোট খুলে আমাকে পরিয়ে দিলে আর আমি খুলে তোমাকে দিলুম আমার স্কার্ফ?"

"হ্যাঁ, মনে আছে। সেদিন কী করে তাড়াতাড়ি সরকারদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেম আমরা দু'জনে, মনে আছে তোমার?"

"হ্যাঁ। তুমি তো আমি না বলা পর্যন্ত বুঝতেই পারোনি।" দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠলেম। সেদিনের সেই অভিজ্ঞতা যেন পুনর্বার উপভোগ করলেম। শিখা আবার বলতে থাকল, "আমি ওদের বাড়ি গিয়েই সবাইকে লুকিয়ে সুযোগ মতো সবগুলি ঘড়িকে দিলুম দেড় ঘণ্টা ফাষ্ট করে। জানতুম যে ন'টার আগে কিছুতেই ওরা উঠতে দেবে না। তার পর আর তোমার সঙ্গে বেড়াবার সময় থাকবে কতটুকু? তাই তো ঐ চুরি করতে হোলো।"

"কিন্তু পরদিন তো ধরা পড়ে গেলে!"

"তার আগে তোমার কাছে ধরা দিয়েছিলেম, তাই ক্ষোভ ছিল না একটুও।" শিখার কথা বলার সেই মধুর চাতুরী আজো অক্ষুণ্ণ আছে।

আমার শুনতে ভালো লাগছিল। হোক মিথ্যা।

এমনি আরো অনেক মধুর কাহিনীর কুশল বর্ণনা করল শিখা। সে সকল কাহিনীর নায়িকার কী মনে হচ্ছিল জানিনে কিন্তু নায়কের কৌতুকের সীমা ছিল না। নিজেকে সেই সব ছেলেমানুষীর দৃশ্যে পুনরায় মনশ্চক্ষে দেখে নিজেকে মনে হোলো চরম নির্বোধ বলে। নির্বুদ্ধিতা—কিন্তু মধুর। জাগ্রৎ বুদ্ধি নিয়ে কে কবে প্রেমে পড়েছে?

শিখা কিছুক্ষণ পরে বলল, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি আমায়

কিছুতেই বুঝলে না। বাকি জীবনের জন্যে পাথেয় হয়ে রইল শুধু ভুল-বোঝা।" শিখা জানে কণ্ঠে কী করে করুণ রস সিঞ্চন করতে হয়।

"এ-আলোচনাটা যদি তুললেই শিখা, তাহোলে বলি, আমি তোমায় ভুল বুঝিনি।"

"ভুল বোঝা নয় তো কী? তুমি সবাইকে বলেছ যে আমি আমার সুবিধে মতো তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি।"

"সবাইকে কেন, কাউকেই আমি অমন কথা বলিনি, কিন্তু," একটু থেমে যোগ করলেম, "কিন্তু যদি বলতেম তাহোলে মিথ্যা বলা হোতো না!"

"আজো কি তুমি তাই মনে করো?" রাগে শিখার সাহিত্যিক মুখোসের অনেকখানি খসে পড়ল।

"তা জেনে আর কী হবে? আগেই বলেছি, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না।"

"ঝগড়া করতে আমারও নিশ্চয়ই ভালো লাগে না। কিন্তু তোমার ভুল-বোঝা ভাঙব বলেই ঘুমে তোমার সঙ্গে দেখা হতেই এখানে আবার দেখা করতে বলেছিলুম।"

"আমি ভুল বুঝলেম কি ঠিক বুঝলেম তাতে কী এসে যায় তোমার? তিন বছর আগে জানুয়ারী মাসে যার পালা শেষ করে দিয়েছ আজ তার ময়না-তদন্ত করে কী লাভ হবে কার?"

"লাভ-ক্ষতির কথা নয়। তুমি সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়াই ভুল বুঝেছিলে।"

"হবেও বা।"

"তোমার ওই কথা এড়িয়ে যাওয়ার ফন্দি, আমার অজানা নয়।"

এই অপ্রীতিকর আলোচনায় আমার রুচি ছিল না। নিশ্চয় জানতেম আমি কোথাও ভুল বুঝিনি। আমি যা জানতেম তার কোনো কিছুই শিখারও অজানা ছিল না। বিরোধ তো ঘটনা নিয়ে নয়, তার ব্যাখ্যা নিয়ে।

ঘটনা নিতান্তই সাধারণ। শিখার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল এক বন্ধুর বাড়িতে। তার পর আরো কিছুদিন সেখানেই দেখা হয়। তারও পরে বাইরে—সিনেমায়, লেকে, ময়দানে। ক্রমে ঘনিষ্ঠ হই। তখন রোজ দেখা হোতো, নয়তো টেলিফোনে কথা। শিখার আত্মীয়দের আপত্তি হয়নি। Euphemistically ওদের বাড়িকে এদিক্ থেকে উদারই বলতে হবে। মাঝে দিন দুই দেখা হয়নি। টেলিফোনও নয়। তৃতীয় দিন গিয়ে দেখি শিখা বাড়ি নেই। শিখার দিদির অভ্যর্থনার শীতলতা থেকেই কম্পিতবক্ষে অনুমান করেছিলেম।

তার দিন কয়েক পরেই হলদে চিঠি পেয়েছিলেম, সঙ্গে ছিল শিখার চিঠি। কী লিখেছিল তার সব কথা মনে নেই। কিন্তু বেশ মনে আছে যে সে চিঠিতে যত মূল্যবান উপদেশ ছিল, তাঁর পুত্রের কাছে লিখিত পত্রগুচ্ছের মধ্যে লর্ড চেস্টারফিল্ডও এত নীতিকথা লিখতে পারেন নি। শিখা লিখেছিল, আমি যেন অযথা শোক না করি, আমি যেন আমার অমূল্য জীবন এ জন্যে নষ্ট না করি, আমি যেন আমার স্নেহপরায়ণ পরিজন-বর্গের কথা বিস্মৃত না হই, আমি যেন আমার প্রতিভার এবং

কর্তব্যের পথ থেকে কখনো বিচ্যুত না হই, ইত্যাদি, ইত্যাদি। শিখা যা করেছে তা ছাড়া তার উপায় ছিল না, আমার বন্ধুত্ব সে কখনো ভুলবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আরো মনে আছে, সর্বশেষে 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখেছিল, আমি যেন চিঠিটা পড়েই ছিঁড়ে ফেলি। অত আবেগের মধ্যেও এই বিচক্ষণ ব্যবস্থাটির কথা বিস্মৃত হয়নি শিখা।

আমার মনে একটুও সন্দেহ ছিল না যে এর সবই শিখার মনে ছিল। কিন্তু এগুলির সঙ্গে তার বর্তমান জীবনের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। তাই তার স্মৃতিতে অতীতের ঘটনাগুলিকে নূতন করে সাজাতে হয়েছে। পরকে, এবং তার চাইতেও বেশি নিজেকে, বোঝাতে হয়েছে যে সে যা করেছিল তাই স্বাভাবিক এবং আমার উপর বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হয়নি। আমি যে আঘাত পেয়েছি সে আমারই দোষ। গোড়াতে হয়তো একথাটা শিখার নিজেকে বোঝাতে নিজের সঙ্গে তর্ক করতে হয়েছে সত্যের সঙ্গে। কিন্তু ক্রমে নিয়ত পুনরাবৃত্তির দ্বারা এখন তা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।

আমি যে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছিনে এবং স্বীকার করছিনে, শিখার তাতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বলল, তুমি "আগা-গোড়াই ভুল বুঝেছ। কে কখন কী মনে করে বসে থাকবে আমি তো আর সে জন্যে দায়ী হতে পারিনে।"

"তুমি দায়ী এমন কথা কি বলেছি কখনো?"

"বলোনি, কিন্তু মনে করেছ।"

"আগেই বলেছি, মনে করলেই বা তোমার কী আসে যায়?"

"সে কথা হচ্ছে না।" শিখা হঠাৎ গলার স্বর একেবারে নামিয়ে করুণ কণ্ঠে বলল, "অবশ্য দোষ আমারই। কেন আমি—?"

আমি বিব্রত বোধ করলেম। শিখার কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেম, "না, না, তোমার দোষ কী? আমারই দোষ।"

শিখা কিছুতেই মানবে না। বারে বারেই বলতে থাকল যে দোষটা তারই। দোষ বলতে যে আমি এক কথা বুঝছিলেম এবং শিখা আর, তা একটু পরে বোঝা গেল।

শিখা বলল, "আমারই দোষ। লোকের ভালো করলে সে যে পরে সে জন্যে দোষ দেবে একথা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। গোড়া থেকেই আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ভদ্র, ভালো ব্যবহার কারো সঙ্গে করলে তার মনে যে এত কথার উদয় হতে পারে এমন কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। সামান্য বন্ধুত্বের যে এমন গুরুতর অর্থ করবে তুমি এ আমি একবারও ভাবিনি।"

"আবার অন্যায় করছ, শিখা। তোমার আমার যে সম্বন্ধ ছিল তার দু'টো নাম নেই। তা নিয়ে দ্বিমতেরও অবকাশ ছিল না। তুমি আপন বিবেচনা অনুযায়ী তা অস্বীকার করেছ। সে জন্যে তোমাকে দোষ দিইনি, আজো দেব না।"

"মোটেই নয়। তুমি আমার দাদার বন্ধু ছিলে। সেই চোখেই বরাবর তোমাকে দেখেছি।"

"দাদার মতো, না?" আমি হাস্য সম্বরণ করতে পারছিলেম না।

"না, দাদার বন্ধুর মতো। একা ছিলে, বিশেষ কারো সঙ্গে পরিচয় ছিল না, বিশেষ কোথাও যাওয়ার ছিল না, তাই আমাদের বাড়িতে আসতে। আমি হেসে তোমার সঙ্গে কথা কয়েছি। তোমার অনেকগুলি নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় আমার কম্প্যানি দিয়ে আতিথেয়তা করেছি। এই তো আমার দোষ।"

"এইটে কেন, কোনোটাই তোমার দোষ নয়। সবটাই আমার দোষ।"

"তোমার ভদ্রতা রাখো। তুমি নিশ্চয় মনে করো আমার দোষ।"

"প্রেমে পড়া তো আমি কখনোই দোষের মনে করিনে।"

এটা শিখা আশা করেনি। হঠাৎ কী বলবে ভেবে পেলে না। বাঙলা প্রেম কথাটাতেই কোথায় যেন একটা অবৈধতার আভাস আছে। বৈধ ভাবে বিবাহিতা শিখা দেবীর কান এ কথাটায় অভ্যস্ত নয়। তাই চমকে উঠেছিল। একটু পরেই আত্মসম্বরণ করে শিখা তার সেই পুরানো মোহিনী হাসি দিয়ে শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে বলল, "সেইটেই তো তোমার ভুল। ছেলে-মেয়ের মধ্যে প্রেম ছাড়া আর কোনো সম্বন্ধে হতে পারে বলেই জানো না তুমি।"

"হতে পারে, না-ও হতে পারে। কিন্তু সে প্রশ্ন অবান্তর। আমরা তো সাধারণ ভাবে নর-নারীর সম্পর্ক নিয়ে অ্যাকা-ডেমিক আলোচনা করছিনে। বিশেষ একটি দৃষ্টান্তের কথা বলছি।"

কণ্ঠে আরো একটু শ্লেষ দিয়ে শিখা বলল, "তাহোলে তুমি

ঠিক ভেবে বসে আছো যে আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলুম।"
শিখা জোরে হেসে উঠল।

আমি বললেম, "আমার বেলা হয়ে গেছে। এবারে অনুমতি দাও তো উঠব।" আমি শিখার হাসিতে বিচলিত হইনি, কেন না জানতেম যে আমি উত্তর দিতে পারি ইচ্ছা করলেই। কিন্তু যাকে একদিন ভালোবেসেছি তাকে আজ অপমান করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমার নৈঃশব্দ্য ও উত্থানেচ্ছায় শিখার বোধ হয় করুণার উদ্রেক হলো। বলল, "বসো আরেকটু।"

বসলেম। শিখা আবার অনেক ভালো কথা বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু, যে দেশলাইয়ের কাঠি একবার জ্বলে নিবে গেছে তা কি আবার জ্বলে?

আমি শিখার পাশেই বসেছিলেম, কিন্তু তার সব কথা ভালো করে শুনেছিলেম না। ভাবছিলেম শিখার অপরিসীম আত্ম-প্রবঞ্চনার কথা। হঠাৎ শিখা প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, তুমি কী করে মনে করলে যে আমি তোমার প্রেমে পড়েছি?"

এবারে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বললেম, "দেখো শিখা আমি যদি মনে করে থাকি যে তুমি আমার প্রেমে পড়েছিলে তবে তোমার আমার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

"মানে?"

"অন্তত খুশি হওয়া উচিত।"

"কেন?"

"কারণ, তাহোলে I took the most charitable view

of what you did. জানো শিখা—কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, এরা সব ষড়যন্ত্র করে প্রেমের এমন একটা মহীয়সী ছবি এঁকেছে যে এর জন্যে অনেক অপরাধ ক্ষমা করা হয়। অনেক কাজ, যা সাধারণত গর্হিত বলে স্বীকৃত, উপন্যাসে দেখবে তার মুখর সমর্থন, কেননা সে কার্যের উৎস ছিল ব্যর্থ অথবা সার্থক প্রেম। কাব্যে দেখবে বহু অবৈধতার সুললিত ব্যাখ্যান ও জয়গান—কারণ একই, প্রেম। এজন্যে অন্যান্য অপরাধ তো সামান্য কথা, হত্যার পর্যন্ত ক্ষমা আছে।

"তুমি আর আমি সেই প্রলাপমুখর দিনগুলিতে যা করেছি কঠোর সমাজনীতিতে তার সমর্থন নেই। তোমার আমার অন্তরঙ্গতার কথাই মনে করো। আজ যদি তোমার কথা অনুযায়ী সেগুলির এই বিচার করি যে তার সব কিছু অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক পক্ষের প্রেমহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে তাহোলে তোমার সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতে হয় সেটা কি শুনতে ভালো লাগবে তোমার?"

"কী বলো।"

"না, বললে কুৎসিত শোনাবে। তুমি জানো নিষ্প্রেম অন্তরঙ্গতার সঙ্গে পৃথিবীর প্রাচীনতম জীবিকার প্রভেদ নিতান্তই সামান্য। কী হবে তার নাম করে? তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ ছিল তা তুমি নিজ হাতে শেষ করে দিয়েছ। ভালোই করেছ হয়তো। তর্ক করব না তা নিয়ে। তবে কি জানো, যদি কখনো নিজের মনের মধ্যে সে-অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করো তাহোলে অন্তত নিজের কাছে এইটে

স্বীকার করাই বুদ্ধিমতীর কাজ হবে যে তুমি প্রেমে পড়েছিলে। সেইটেই তোমার সব চেয়ে ভালো ডিফেন্স।”

এবার শিখার বলার পালা যে তার সময় হয়েছে এবং তাকে উঠতেই হবে।

আমি বাধা দিলেম না।

সাত

সমগ্র বিশ্বই পান্থশালা কি না জানিনে—ধর্মশালা যে নয় তা জানি—কিন্তু দার্জিলিংকে মুসাফিরখানা ব'লে ভুল করা অসম্ভব নয়। এত হোটেল বোধ হয় এদেশে আর কোথাও নেই। কলকাতায় প্রায় প্রত্যেক পঞ্চম দোকানই যেমন স্যাঙ্গুভ্যালি চায়ের দোকান এবং প্রত্যেক দশম আপিসই অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, দার্জিলিঙেও তেমনি হোটেল আছে কয়েক বাড়ি পরে পরেই। সেগুলির বেশির ভাগেরই অবস্থিতি মনোরম ও ব্যবস্থা সুষ্ঠু। সেগুলিতে বাস করা শাস্তি নয়, স্বস্তি। সেখানে অবস্থান গৃহ থেকে নির্বাসন নয়, আকাঙ্ক্ষিত পলায়ন। অতিথি এখানে অবাঞ্ছিত বা অনাহূত নয়, আমন্ত্রিত।

সদ্য-স্বাধীন ভারতের উন্নয়ন সাধনের জন্যে চাই প্রচুর বিদেশী মুদ্রা। আমাদের হাতে তার পরিমাণ পরিমিত। আয়ের পন্থাও অগণিত নয়। ষ্টার্লিং এলাকায় আমরা বন্দী। তার বাইরে আমাদের কিনতে হয় আজকের জন্য খানা, কালকের জন্য কল-কারখানা। কিন্তু কিনব কী দিয়ে? হাতে পাউণ্ডও আছে, রিজার্ভ ব্যাংকে না হলেও ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু চাই যে ডলার। ডলারের দেশে পাঠাবার মতো পসরা আমাদের বেশি নেই।

বিদেশী মুদ্রা অর্জন করবার একটা উপায় হচ্ছে পরদেশীকে আমাদের ঘাটে ডিঙা লাগিয়ে পান খেয়ে যেতে প্রলুব্ধ করা। এই টুরিস্ট ট্রেড এখন বৃটেন স্থরু করেছে পরম উৎসাহে। তারও আমাদের অবস্থা—ডলার নেই। আমাদের সরকারও টুরিস্ট সম্বন্ধে সমান উৎসাহী।

ভারতের ইতিহাস এদিক থেকে আমাদের পরম সম্পদ। কিন্তু তবু পরদেশীর মন ভোলাতে পারছি কই আমরা? রেলে, ষ্টীমারে যাতায়াতের অসহ্য অস্থবিধা যে হারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তা থেকে ভ্রমণবিলাসীর পক্ষে উৎসাহ সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। রেলওয়ে রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুম এবং ডাইনিং কার থেকে পানীয় নির্বাসন করে নৈতিক সংস্কার সাধনের যে ব্যবস্থা হয়েছে তা থেকেও বিদেশীর ভ্রমণপিপাসা দুর্দমনীয় হয়ে উঠবার কথা নয়।

এ সমস্ত আনুষঙ্গিক অস্থবিধার কথা উপেক্ষা করলেও ভারতের ভ্রমণ-উদ্যোগের প্রধানতম অন্তরায় আমাদের হোটেল ব্যবস্থা অর্থাৎ অব্যবস্থা। কয়েকটা প্রাদেশিক রাজধানীর গুটিকয় হোটেলের কথা বাদ দিলে তার বাইরে আবাসযোগ্য একটা হোটেল মেলা ভার। হোটেল নাম ধরে যেগুলি আছে সেগুলি হয় জেল নয় হাজত। কোনো কোনোটা বা দান্তের মহাকাব্যের প্রথমাংশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই অবস্থার জন্যে দায়ী আমাদের চরিত্রগত স্থাণুতা : এই স্থাণুতার ফল আমাদের দেশব্যাপী হোটেল-হীনতা।

দার্জিলিঙের অন্যান্য অনেক কিছুর মতো তার হোটেল-

ব্যবস্থাও এই সাধারণ ভারতীয় নিয়মের ব্যতিক্রম। মরশুমী অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্যে ছোটো বড়ো মাঝারি যত হোটেল আছে তার অধিকাংশই ব্যবস্থাপন্ন। অবস্থাপন্নদের জন্যে আছে মাউন্ট এভারেস্ট, উইণ্ডামিয়ার ইত্যাদি। মাথা-পিছু সেখানে দৈনিক দক্ষিণা পঁচিশের কাছাকাছি। তার নীচের স্তরের জন্যে আছে বেলভিউ, সেণ্ট্রাল, সুইস্ ইত্যাদি।

হোটেলগুলির দক্ষিণাও কিন্তু দার্জিলিঙের আবহাওয়ারই মতো পরিবর্তনশীল। শরতে আর বসন্তে যখন সমাগম হয় সর্বাধিক তখন মূল্য থাকে শীর্ষে। শীত আর বর্ষার বিমুখ অতিথির পকেটের তুষ্টিবিধানের জন্য দক্ষিণার হ্রাস হয়—কলকাতায় যেমন ছিল ট্রামের চীপ্ মিডডে ফেয়ার। কিন্তু সব হোটেল আবার সারা বছর খোলা থাকে না। বেশির ভাগই মরশুমী ফুলের মতো নির্দিষ্ট ঋতুতে দ্বার খোলে, চোখ মেলে। কুসুমের মাস শেষ হলে নীরবে বিদায় নেয়।

শরতে আর বসন্তে কিন্তু এই হোটেলগুলিতে প্রতিযোগিতার অন্ত থাকে না। প্রতিযোগিতা শুধু হোটেলের মালিকদের মধ্যে নয়, সেগুলির অতিথিদের মধ্যেও। সে প্রতিযোগিতা ব্যবসাগত নয়, শ্রেণীগত। মাউন্ট এভারেস্টের কৌলীন্য নেই স্নো-ভিউ বা হিল-ভিউ হোটেলে। অক্টোবরে বা এপ্রিলে তাই ম্যালে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে মাউন্ট এভারেস্টবাসিনী মিত্রজায়া বসুজায়াকে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে বসুজায়া উত্তর দেন, "আর বোলো না ভাই, আমি সেই জুলাই মাস থেকে বলছি যে আগে থেকে লিখে জায়গা রিজার্ভ করো। কিছু না হোক হাজারবার

বলেছি। ওর নাকি সময়ই হয় না। শেষ মুহূর্তে এসে আর কোথাও কোনো জায়গা না পেয়ে নিরুপায় হয়ে উঠতে হয়েছে —এ !" সম্ভাব্যতার দিক থেকে বসুজায়ার উক্তি নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য নয়, কিন্তু বিশ্বাস করে না কেউ এমন কথা। একথা বসুজায়ারও অজ্ঞাত নয়, কিন্তু তবু বলতে হয়। মিত্রজায়াকেও তাঁর অবিশ্বাস গোপন করতে হয় স্মিতহাস্যের অন্তরালে।

এমন অজস্র হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় মরশুমী দার্জিলিঙে, কেন না সেখানে ভ্রমণের জন্যেই তো শুধু যাওয়া হয় না, যাওয়া হয় সামাজিক রীতির অলংঘ্য আইনের প্রতি অন্ধ আনুগত্যে। ইংরেজিতে ওরা যাকে বলে জোন্‌স্‌দের সঙ্গে সমান তালে চলা, এ হোলো তারই স্বদেশী সংস্করণ। মিস্টার মিত্র গেলে মিস্টার বসুকে যেতেই হবে এমন ধ্রুব নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু মিসেস্ বসু এমন একটা গুরুতর বিষয়ে মিসেস্ মিত্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করবেন একথা উচ্চারণ করবার মতো হঠকারিতা যার আছে ঈশ্বর তার সহায় হোন !

পুরুষে পুরুষে বৈষম্যের বিভিন্ন মান আছে। পরস্পরের উৎকর্ষ অপকর্ষের প্রসঙ্গও সেখানে অবান্তর নয়। মিস্টার দত্তর সঙ্গে মিস্টার সেনের যে প্রভেদ তা প্রধানত এই যে প্রথমজন ক্লাস ওয়ান অফিসার আর দ্বিতীয়জন ক্লাস টু। মিসেস্ দত্তর সঙ্গে কিন্তু মিসেস্ সেনের এমন সুস্পষ্ট প্রভেদ নেই। এ দু'য়ের প্রতিযোগিতায় তাই অন্যান্য প্রসঙ্গের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

তাই হয়তো দত্ত এবং সেনকে ম্যালে দিনের পর দিন দেখা যাবে একই পুরানো রিফু-করা ফ্ল্যানেল আর টুইডে, যদিও

দত্তজায়ার বেলায় একই শাড়িতে একাধিক আবির্ভাব একেবারেই অভাবনীয়। তাঁদেরও দু'জনের মধ্যে সাম্য নেই, কিন্তু তাঁদের বিরোধে বেশভূষার মূল্যটা চরম বিচার নয়। দত্ত সেনকে পরাস্ত করতে পারেন চাকরিতে, খেলায়, খ্যাতিতে। সেনের উপর দত্তর যে শ্রেষ্ঠত্ব তা আপন ক্ষমতার দ্বারা অর্জন-সাধ্য। এ দু'য়ের দ্বন্দ্বের ফলাফল নির্ধারিত হয় পরস্পরের কর্মক্ষমতার দ্বারা। সাধারণ্যে পুরুষকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয় তার শৌর্য দিয়ে কিম্বা তার মেধা দিয়ে। এ-সংগ্রামে কোনো না কোনো একটা রকমের শক্তি চাই এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা নিজের হতে হয়, ঋণ করা চলে না।

বৈচিত্র্য-প্রীতির জন্যেই হোক বা অন্যতর কোনো উদ্দেশ্য-সাধন মানসেই হোক, প্রকৃতি অবলাকে বঞ্চিত করেছে এই শক্তি থেকে। তার শক্তি মোহিনী শক্তি। বিশেষ বয়সে, সুনির্ধারিত প্রয়োজনে তার সার্থকতা এবং তার সবটুকুই কেবলমাত্র পুরুষের 'পরে প্রযোজ্য। কোনো মেয়ে সর্বস্ব বিলিয়ে দেবে না তার কোনো স্বজাতীয়ার রূপমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে। বরং ঈর্ষাবিষাক্ত কটাক্ষপাতে রূপশালিনীকে ভস্মীভূত করবার চেষ্টার ত্রুটি করেন না তাঁর বান্ধবীবাহিনী।

একমাত্র দেহসৌন্দর্য ব্যতীত মেয়েদের মধ্যে একের সঙ্গে অপরের পার্থক্যের পরিসর নিতান্তই সংকীর্ণ। তাই তাদের মধ্যে দৈনন্দিন সামান্যতার ঊর্ধ্বে প্রতিযোগিতার অবকাশ এত অল্প। সরোজিনী-বিজয়লক্ষ্মীদের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ নারীরই সামাজিক জীবনে স্থান নির্ধারিত হয় প্রথমে পিতৃ-

স্কুলের কল্যাণে এবং পরে পতিদেবতার সাফল্যে বা অসাফল্যে। তাই তাদের মান আগলে রাখতে হয় অনুক্ষণ অন্তহীন যত্নভরে। ময়ূর পারে তার পুচ্ছকে তুচ্ছজ্ঞান করতে। আত্মবিশ্বাসহীন বায়সের সে সাহস আসবে কোত্থেকে ?

চামড়ার তলায় কর্ণেল-পত্নী ও জুডি ও' গ্রেডি যে অভিন্না ভগিনী, এই আত্মীয়তা অস্বীকার করতে কর্ণেল-পত্নীর তাই প্রতি পদক্ষেপে জুডিকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে তিনি যাঁর স্কন্ধলগ্না তাঁর স্কন্ধে একটি ক্রাউন ও দু'টি তারা শোভা পায়। স্বামীর য়ুনিফর্ম পরিধান করে বাইরে বেরুবার উপায় নেই, সব সফল স্বামীর আবার য়ুনিফর্মও নেই। কর্ণেল-পত্নীর মহিমার প্রত্যক্ষ উদ্ভাসনের জন্যে তাই উদ্ভাবন করতে হয়েছে অন্যান্য পন্থা। যাতে কখনোই তাঁকে জুডির জুড়ি বলে ভুল না হয়। যে-প্রভেদের অস্তিত্বই নেই তাকে প্রত্যক্ষ করানো প্রতিভাসাপেক্ষ।

এই দুর্লভ ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতার অনুশীলন করতে হয় মিত্রজায়ার। তাই তন্দ্রা নাহি আর চক্ষে তাঁর—তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা, সদা আন্দোলন। মিসেস্ সেন বুঝি মাদুরা থেকে নতুন রকমের একটা শাড়ি আনিয়েছে ? তারও দূরে কোথাও থেকে আরো নতুন একটা কিছু না আনা পর্যন্ত মিত্রজায়ার নিদ্রার ঘটল নির্বাসন। মিসেস্ ঘোষ বুঝি প্রাচীন উৎকল থেকে উদ্ধার করেছে আধুনিক গৃহসজ্জার নবীন কোন উপকরণ। মিত্রজায়াকে তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরণ করতে হয় মোহন-জেদারোয়, আরো প্রাচীন কিছুর সন্ধানে। তাঁর

উদ্দেশ্যটা যে একেবারে অবিমিশ্র ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা এমন বললে পূরো সত্য বলা হবে না।

নিয়ত পরিবর্তনশীল এই ফ্যাশানের অবিরাম প্রতি-যোগিতায় অগ্রভাগে থাকতে হলে প্রখরতম দৃষ্টি রাখতে হয় পরিচ্ছদের উপর। সেদিক থেকে দার্জিলিঙের মতো প্রদর্শনী-ক্ষেত্র ভারতে দুর্লভ। হেমন্তের শেষে সন্ন্যাসী শীত হিমগিরি ফেলে নিচে নেমে এসে হয়তো বিচ্ছেদভারে বনচ্ছায়ারে বিষণ্ণ করে এবং ঝরা-পাতার ঝড় উড়িয়ে 'যাহা কিছু ম্লান বিরস জীর্ণ, দিকে দিকে দেয় করি বিকীর্ণ'। কিন্তু প্রকৃতির যেখানে শেষ সেইখানেই তো আর্টের সুরু! প্রকৃতির যখন বৈধব্যের, শুভ্রতার, সাজ খসাবার পালা, মানবীর সাজ পরবার সেইটেই প্রশস্ততম ক্ষণ।

পরিচ্ছদ-রচনার জন্যে গ্রীষ্মের চাইতে প্রতিকূল ঋতু আর নেই। প্রখর তপন-তাপে ঘরের বাইরে পা বাড়ানো মানে পা পোড়ানো। তখন কে যাবে বেরুতে বেড়াবার জন্যে? আর বাইরেই যদি না যাওয়া গেল, 'তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা?' নির্বাক বহ্নি যখন শুধু মাত্র অন্তরে দহে না, দেহেও, তখন অঙ্গে সামান্যতম আবরণ ধারণ করাই প্রাণান্তকর ক্লান্তি। তার উপর আবার বিলাসের বাহুল্য বোঝাই করবার উৎসাহ থাকে না কারো। গরমের পরে আবার যদি থাকে কলকাতার হিউমিডিটি, তাহোলে পোষাক করতে গায়ে ঝরে ঘাম, আর চোখে আসে জল।

সমতলবাসিনী তাই সারা বছর ধরে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে

থাকেন দার্জিলিং আরোহণের প্রতীক্ষিত অবসরের পানে। তখন ডাক পড়ে দর্জির, দোর খোলে ওয়ার্ডরোবের। বেরিয়ে আসে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্রতর বস্ত্রের সম্ভার—ম্যালের বেঞ্চিতে বসে বিস্ফারিত 'নেত্রে গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

ইংরেজিতে যাকে 'ফিগার' বলে, ভারতীয়াদের সৌন্দর্যের সেটাই ঠিক *forte* নয়। ব্যায়ামের স্বল্পতা এবং নিদ্রা ও আহারের অকৃপণতার কল্যাণে বেশির ভাগ ভারতীয়া মেদ-বাহুল্যে বিব্রত হন জীবন-মধ্যাহ্নের অনেকগুলি প্রহর আগে। তাই প্রসাধনকারিণীর প্রধান সমস্যা প্রকাশন নয়, লুক্কায়ন; উদ্ঘাটন নয়, আচ্ছাদন। দার্জিলিঙের শীত এদিক থেকে কুশল রূপায়ণের পরম সহায়।

তবু এমন কথা বলা চলবে না যে শৈলবিহারিণীগণ প্রত্যেকেই এই সহজ সত্যটা স্বীকার করেন। প্রকৃতিদত্ত সুযোগ হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করে বিদেশিনীদের অনুকরণে তাঁরা যে পরিধেয় নির্বাচন করেন তাতে না থাকে ভূগোলের মান, না রুচির। অধুনা যেটার প্রচলন ভয়াবহ বেগে প্রসার লাভ করেছে তার নাম 'স্ল্যাক্‌স্'—ট্রাউজারসের স্ত্রী-সংস্করণ। লালিত্য-বিরহিত এই পোষাকটায় সুন্দরীর রূপ বৃদ্ধি পায় না, অসুন্দরীর অকিঞ্চিৎকরতা মুখরা হয়ে লজ্জা বাড়ায় মাত্র।

রূপগ্রহণে আমি আপোষবিহীন অদ্বৈতবাদী নই। কবির মতো সর্বশেষের গানটি আমার কেবল মাত্র কল্যাণী গ্রামবধূর জন্যেই রিজার্ভড্ নেই: হলিউডের গড়া ডিভান শায়িতা

রূপসীরাও আমার মুগ্ধদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত নয়। মেঘলা দিনে কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ দেখে আমার হৃদয় যেমন ময়ূরের মত নাচে, তেমনি আলোকোদ্ভাসিত ব্রডওয়ের প্রশস্ত পথেও সৌন্দর্যের সন্ধান পেলে আমার হৃদয়ে পুলকের অকুলান ঘটবে এমন আশংকা করিনে।

কিন্তু অর্থনীতির মতো রূপায়ণেও আমি টেরিটোরিয়্যাল ডিভিশনে বিশ্বাসী। মাদাম্ চিয়াং কাইশেককে শাড়ি-পরিহিতা দেখে মুগ্ধ না হলেও ক্ষুব্ধ হইনে; কিন্তু ক্লদেৎ কোলবেয়ারকে বেনারসী-বিভূষিতা দেখলে নিতান্তই লাঞ্ছিত বোধ করি, যেমন লাঞ্ছিত বোধ করি স্ল্যাক্স্‌মণ্ডিতা মিত্রজায়ার আবির্ভাবে!

সাধারণ ভাবে এ কথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে পাশ্চাত্য সৌন্দর্যের প্রধানতম গৌরব হচ্ছে তার glamour আর আমাদের মেয়েদের সম্পদ হচ্ছে তাদের grace ওরা ওদের উদ্ধত ঔজ্জ্বল্য দিয়ে চোখকে ধাঁধায়, এরা এদের স্নিগ্ধ লাবণ্য দিয়ে নয়নকে তৃপ্ত করে।

সৌন্দর্যসৌধে অনেক ম্যান্‌সন্ আছে। তাই বুঝতে পারিনে লালিত্যের রাজ্যের সম্রাজ্ঞী মিত্রজায়া কেন ঔজ্জ্বল্যের কক্ষে ভিখারিণী হতে যান।

কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁর পক্ষে রূপচর্চাটা শুধু মাত্র কলাবিচারসাপেক্ষ নয়। শ্রেণী-বিভাগের প্রশ্নটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পরিচ্ছদের দুর্মূল্যতায় আর ঔজ্জ্বল্যে সারা বিশ্বকে এ-কথাটা উচ্চৈঃস্বরে জানাতেই হবে যে ঐশ্বর্যের দ্বন্দ্বে মিত্রজায়া কারো কাছেই হার মানবেন না।

কিন্তু মিত্রজায়া তাঁর প্রথম উদ্দীপনাকে দ্বিতীয় চিন্তার পরিণতি থেকে সজোরে রোধ না করলে বোধ হয় উপলব্ধি করতে পারতেন যে কিঞ্চিৎ দ্বিধাই সমীচীন হতো। মিস্টার মিত্রের সমৃদ্ধির জন্যে নয়, মিত্রজায়ার নিজেরই সম্মান রক্ষার জন্য।

প্রাচীন সমাজে গৃহকর্ত্রীর একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। গৃহমঞ্চে তাঁর অস্তিত্বের সার্থকতা কেবল মাত্র শোভাবর্ধনেই নিবদ্ধ ছিল না। সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ করে অসংখ্য পারিবারিক কর্তব্য সাধন করে তিনি পুনরায় যখন শয্যাগৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন রাত্রি আর কিশোরী থাকত না।

পরিবার পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অংশ ছিল সর্বতোভাবে সক্রিয়—কেবল মাত্র দীন জনের কুটীরে নয়, ধনিজনের ভৃত্যসংকুল প্রাসাদেও। গৃহকর্ত্রীর অপরিসীম ব্যক্তিত্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকতো প্রতি গৃহের নিপুণ পরিচ্ছন্নতায় আর সুস্পষ্ট সুচিতায়। তাঁর কাজ শুধু প্রদর্শন ছিল না। এমন কি শুধু মাত্র পরিদর্শনও নয়। তিনি প্রতিটি কাজে নিয়োজিত করতেন নিজের হাত। আমাদের সকলের মনে মা-ঠাকুমার যে ছবি আছে তা এই ছবি। গৃহকর্ত্রী তখন বাইরে গিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন না, কিন্তু সংসার-পরিচালনায় তাঁর কাজ ছিল ফুল-টাইম্ জব।

এদেশের আধুনিকাদের কিন্তু এমন দাবী করবার অধিকার নেই একেবারেই। তাঁদের গৃহকর্মের জন্যে আছে দাসদাসী, শিশু-পরিচর্যার জন্যে আয়া, অন্যান্য কাজের জন্যে অন্যান্য

লোক। পরিবার-পরিচালনের কাজে আজকের গৃহকর্ত্রী ঠিক যতটা কাজ করেন তার পরিমাপ করলে টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাবে তার যা মজুরি নির্ধারিত হবে তা দিয়ে তাঁর একটি বেলার প্রসাধনেরও খরচ উঠবে না।

তাই আজ যদি মিত্রজায়াকে বলি, ঠিক কিসের বিনিময়ে তিনি মিত্রার্জিত অর্থের অপব্যয়ের অধিকার লাভ করেছেন তাহলে মিত্রজায়া শিউরে উঠবেন!

নেপালী মেয়েরা কিন্তু এ অপবাদ সহ্য করবে না কোনো মতেই। কর্মিষ্ঠতায় ও কর্মক্ষমতায় ওরা নেপালী পুরুষদের সমকক্ষ নয়, অগ্রণী। হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, সর্বত্রই দেখা যায় নেপালী মেয়েদের অসাধারণ কর্তৃত্ব এবং অসাধারণ আত্ম-নির্ভরতা। শুনেছি এমন পরিবারও বিরল নয় যেখানে স্ত্রীর উপার্জনেই পরিবারের অন্নসংস্থান হয় এবং স্বামীই অলংকার-রূপে শোভা পান। নেপালীদের মধ্যে তাই শিভ্যাল্‌রাস্‌ পৌরুষবোধটা ঠিক সার্বজনীন নয়। 'তোমার বসে থাকা, আমার চলাচল'—এটা স্ত্রীর প্রতি নেপালী পুরুষের উক্তি নয়। তিনি বরং প্রায়শই তুম্বামত্ত হয়ে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে বলেন, "কেই ফিকর গরনু পড়দেই না—যো হুনছা দেখা জালা!"

মূল নেপালী উক্তি সমেত স্থানীয় আচারের পরিচয় দান করছিলেন মিসেস্‌ রায় আমার বাসস্থান 'কাঞ্চনজংঘা কর্ণারের' একচ্ছত্র পরিচালিকা। এটা ঠিক হোটেলও নয়, বাড়িও নয়। অতিথি এখানে উভয়েরই সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

একা থাকতে চাইলে নিঃসঙ্গতায় বাধা দেবে না কেউ। নিঃসঙ্গ বোধ করলে মিসেস্ রায়ের হাস্যময়ী উপস্থিতিতে শূন্যতা বোধের নিরসন হয়।

রায় মশাই বেশির ভাগ সময়েই বাইরে থাকেন। অতিথির অভাব-অভিযোগ শোনা এবং তার প্রতিকারের ভার তাই মিসেস্ রায়েরই। তাছাড়া ভাষাগত অসুবিধার জন্যেও তাঁকেই অতিথি এবং ভৃত্যদের মধ্যে liaison-র কাজ করতে হয়। কেউ গরম জল চাইলে মিসেস্ রায় তৎক্ষণাৎ মৃদু কিন্তু মন্দ্র কণ্ঠে "কাঞ্চা" বলে সম্বোধন করে নেপালী ভাষায় আদেশ করেন।

নেপালী ভাষায় অনর্গল কথোপকথনে মিসেস্ রায়ের অদ্ভুত দক্ষতা দেখে প্রথম দিনই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেম, "আপনি এত চমৎকার নেপালী শিখলেন কী করে?"

মিসেস্ রায় উত্তর দেবার আগেই মিস্টার রায় বললেন, "কিছু নয়। খুব সোজা ভাষা। বাঙলার সঙ্গে অনেক মিল আছে। আপনি যদি মাস তিনেক থাকেন তো আপনিও অনায়াসে শিখে ফেলবেন।" ইত্যাদি।

'কাঞ্চনজংঘা' বাংলোটা বৃহৎ নয়। নিজেদের জন্যে একটি মাত্র ঘর রেখে বাকী চারটে তৈরী করেছেন দক্ষিণাদাতা অতিথিদের জন্যে। সীজনে ঘরগুলো বড়ো একটা খালি থাকে না, কখনো-কখনো বা উপচে পড়ে। কিন্তু এখন আমি ছাড়া অন্য অতিথি আর নেই। তাই পৌঁছোবার কিছুক্ষণ পরে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি আমার বাক্স-বিছানা সব কিছু খুলে

জিনিষ-পত্তর বের করে দু'টো পাশাপাশি ঘরে সুন্দর সুবিন্যস্ত ভাবে সাজানো রয়েছে। বিদেশে এমন পরিপাটী ব্যবস্থা আমি নিজে কখনোই করে নিতে পারতেম না। এই সব ব্যবস্থায় যে নিঃসন্দেহে 'ফেমিনিন্ টাচ' ছিল তা অন্ধেরও বুঝতে বাকী থাকে না।

মিসেস্ রায় একটু পরেই এসে বললেন, "কী, ঘর দু'টো পছন্দ হয়েছে তো ?"

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে বললেন, "চলুন, খাবার দেয়া হয়েছে।":

আমি শীতে কাঁপতে কাঁপতে আয়নার সামনে হাত দিয়ে অবাধ্য কেশরাশি নিয়ে উদ্ব্যস্ত আছি দেখে মিসেস রায় হাসছিলেন। চিরুণী আনতে যে ভুল হয়ে গেছে এই কথাটা স্বীকার করতে সংকোচের সীমা ছিল না।

মিসেস রায় তেমনি হাসতে হাসতে বললেন, "দাঁড়ান, এখনি একটা কাংগো এনে দিচ্ছি আপনাকে।"

কাংগো ? সে কী জিনিষ ? অন্তর্হিতা মিসেস রায়ের পুনরাবির্ভাবে বোঝা গেল যে তা চিরুণীর চাইতে ভয়াবহ কিছু নয়। কিন্তু কাংগো কেন ? চিরুণী নয় কেন ? কে জানে !

খাবার-ঘরে গিয়ে দেখা গেল রায় নেই সেখানে। জিজ্ঞাসায় জানলেম যে রায় কাজে গেছেন, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। এই অনুপস্থিতি যে রীতিই, ব্যতিক্রম নয়, তা দিন কয়েকের অবস্থিতিতে স্পষ্ট হোলো।

আমার জীবনটা ঠিক শিশুদের অভিনয়োপযোগী একেবারে

স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত নাটক নয়। কিন্তু মিসেস রায়ের প্রিসিডেণ্ট নেই আমার অভিজ্ঞতায়।

মহিলার আতিথেয়তায় যে নির্ভুল প্রতিভার পরিচয় আছে তা নিখুঁতভাবে এফিসিয়েণ্ট—সামান্যতম অপব্যয়ের বিরুদ্ধে তাঁর উদ্যত তর্জনীকে ভৃত্যরা ভয় করে—কিন্তু এই দক্ষতাকে আচ্ছন্ন করে আছে তাঁর সুমধুর ব্যবহার। তার মধ্যে স্নিগ্ধ আন্তরিকতার আভাস আছে কিন্তু অত্যধিক অন্তরঙ্গতা নেই। তা শুষ্ক ভদ্রতাই শুধু নয়, কিন্তু আর্দ্র আদর দ্বারাও সে আপ্যায়ন জর্জরিত হয়নি। মহিলার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে গ্রেস্ এবং ডিগনিটির। তাঁর গ্রেস অতিথিদের হৃদয় আকৃষ্ট করে। কিন্তু তাঁর ডিগনিটি রায়কে ক্লিষ্ট করে।

এই ক্লেশ গোপন করতে রায়ের চেষ্টার অন্ত নেই। আগন্তুকের সম্মুখে ওদের দু'জনের ব্যবহারে সামান্যতম সন্দেহেরও কারণ হয় না যে ওরাই বিশ্বের আদর্শ-দম্পতি নয়। রায়কে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর আসে, "তাই তো, তা আপনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু মিসেস্‌কে একবার জিগেস করা যাক, কী বলেন? হে হে, তাঁর মতটার খোঁজ নেয়া যাক, হে হে।"

এটা যে রুটিন কনসাণ্টেশন নয়—বরং ফর ফেভার অব অর্ডারস—তা বোঝা যায় এই থেকেই যে রায়-গৃহিণী কখনো অনুরূপ আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন না। তাঁর ডিসীশন সর্বদা জিহ্বাগ্রে। এই দ্বিধাহীন আত্ম-প্রত্যয়ের উৎস যে কী সে তথ্য পরে একদিন প্রকাশিত হোলো।

সেদিন সকালে শীতের দার্জিলিঙে আলোর আভাসটুকুও ছিল না কোনো দিকে। সূর্য ছিল নিরুদ্দেশ। আকাশে কোথাও তার খোঁজ না পেয়েই বুঝি মেঘগুলি নেমে এসেছিল মাটির কাছাকাছি। সঙ্গে এনেছিল এক রাশি দুর্ভেদ্য কুয়াশা। আমি আমার শয্যা থেকে এক মুহূর্তের জন্যে গলা বাড়িয়ে জানালার বাইরের রূপহীন, রসহীন, অন্তহীন নকল সন্ধ্যার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করে তৎক্ষণাৎ আবার লেপের তলায় অন্তর্হিত হয়েছিলেম। যে-দিনের দিন হয়ে দেখা দেবার সাহস নেই, কাজ নেই অমন দিনকে 'সুপ্রভাত' বলে লজ্জা দিয়ে।

দরজায় আঘাতের উত্তরে 'কাম ইন' বলার আহ্বানে যিনি প্রবেশ করলেন তিনি রায়-গৃহিণী। এটা যে একেবারে অপ্রত্যাশিত তা নয়। কিন্তু আশাতীত ছিল তাঁর সেদিন সকালের রূপ।

মিসেস রায়কে অসামান্যা সুন্দরী বললে অতিরঞ্জন হবে যদিও সৌন্দর্য্যের প্রথম পরীক্ষায়—গাত্রবর্ণে—তিনি অত্যন্ত সসম্মানেই উত্তীর্ণ হবেন। তাঁর বর্ণ শুধু সাদা অর্থে ফর্সা নয়, তার সঙ্গে মেশানো আছে রামধনুর আরো অনেকগুলি রঙ। একটু হাসলেই তারা খেলায় মাতে মিসেস রায়ের আনন ভরে।

সেদিন কিন্তু তাঁর মুখে হাসির আভাসটুকুও ছিল না কোনোখানে। চুল ছিল এলোমেলো, স্ফীত চোখে ছাপ ছিল পূর্বরাত্রির নিদ্রাহীনতার। গায়ের উপর হেলাভরে ফেলা ছিল ফারের ওভারকোট। তার শূন্যগর্ভ হাতা দু'টো দু'দিকে দুলছিল

অসহায়ভাবে। দুঃখ মানবের চরিত্রকে উন্নত করে কি না জানিনে, কিন্তু বেদনা যে অনেক সময় নারীর রূপকে গাম্ভীর্য-মণ্ডিত করে ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য দান করে তার প্রমাণ সে সকালের মিসেস রায়।

"আচ্ছা, রায় কি আপনাকে কিছু বলেছে? কাল বিকালে?" নানা মামুলি আলাপের মধ্যে অকস্মাৎ মিসেস রায় প্রশ্ন করলেন।

রায় অত্যন্ত সাধারণ একটি নিরীহ ব্যক্তি। উল্লেখযোগ্য বা স্মরণীয় কোন উক্তি তাঁর কাছে কখনোই শুনেছি বলে মনে করতে পারলেম না, পূর্বদিনের বিকালে তো নয়ই। রায় ভালো মানুষ, তার সম্বন্ধে আর কিছু বলার নেই। মিসেস রায়ের প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ভাবে পাল্টা প্রশ্ন করলেম, "কী সম্বন্ধে বলুন তো?":

মিসেস রায় চুপ করে রইলেন। তাঁর মুখে ছিল দুশ্চিন্তার ছাপ, কিন্তু শুধু দুশ্চিন্তার নয়। কেন বলতে পারব না. কিন্তু তাঁকে দেখে আমার মনে সন্দেহ রইল না যে বেশ গুরুতর একটা কিছু হয়েছে। কিন্তু জানতেম যে জিজ্ঞাসায় কৌতূহলের প্রশমন হবে না।

কিছুক্ষন নীরব থেকে মিসেস রায় উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর চোখ ছিল বাইরে। সেখানে দৃষ্টি নিষ্ফল। কাকে উদ্দেশ করে জানি না, বাইরের অন্ধ-বধির কুয়াশাকে না আমাকে, মিসেস রায় বললেন, "সেই কাল বিকেলে যে বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি।"

বাক্যটির, এবং কার্যটির, কর্তা যে রায়ই তাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমি কী করতে পারি ভেবে পেলেম না। সাধারণত তিনি কোথায় যান, এ রকম বাইরে থাকা স্বাভাবিক কি না, ইত্যাদি মামুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে মিসেস রায়ের ধৈর্যচ্যুতি ঘটালেম কিন্তু তাঁর চিন্তার লাঘব হোলো না একটুও।

হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, "না, না, না। সে সব কিছু নয়। আমি জানি ও আর ফিরবে না!"

ফিরবে না? কেন? কিছুই বুঝতে পারলেম না। কোনো কিছু বলার না থাকলে কোনো কিছু না বলাই যে সব চেয়ে ভালো তা আমিও জানি, কিন্তু তখন মনে ছিল না। একান্ত নির্বোধের মতো বললেম, "তা—তা হোলে তো বড়োই মুস্কিলের কথা!"

"মুস্কিল? কার? আমার কথা ভাবছেন? আমার একটুও মুস্কিল হবে না," মধুরা মিসেস রায়ের কণ্ঠে যে এমন হিংস্রতা নিহিত ছিল জানতেম না, "তবে, তবে ওর একটু মুস্কিল হবে হয় তো।" দাঁতে ঠোঁট কামড়ে যোগ করলেন, "এবং তাতে আমি খুশি বৈ দুঃখিত হবো না।" মিসেস রায় দ্রুতপদে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি নির্বোধ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইলেম।

বিকালের দিকে আবার যখন মিসেস রায়ের সঙ্গে দেখা হোলো সকালের ক্রোধ তখন শান্ত হয়েছে। ধূলো উড়িয়ে ঝোড়ো হাওয়া স্তব্ধ হয়েছে, বর্ষণের পালা এবার। অপমানাহত উষ্মা তখন অভিমানে পরিস্রুত হয়েছে।

কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই মিসেস রায় বললেন, "রায় যখন নেই, আপনি নিশ্চয়ই এখানে আর থাকবেন না ?"

কথাটা যে আমারও মনে হয়নি তা নয়। নিজের দুঃখের অন্ত নেই। অপরের বেদনা দিয়ে বোঝা বাড়াবার আর ইচ্ছা ছিল না। সকাল থেকেই অজুহাত উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেম। কিন্তু মিসেস রায় নিজেই যখন সেই প্রসঙ্গের উত্থাপন করে নিষ্ক্রমণের পথ এত সহজ করে দিলেন তখন কিছুতেই পারলেম না সেই সুযোগ গ্রহণ করতে। একটু ইতস্তত করে বললেম, "না, না, এখনি যে যেতে হবে এমন কী কথা আছে ?"

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সকালের সেই দৃপ্তা রমণী করুণ, অসহায় মিনতির সুরে বললেন, "সত্যি থাকবেন আপনি আমার এখানে ?"

আমি কী বলেছিলেম মনে নেই। ভয়ানক বীররসপূর্ণ কিছু নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু মিসেস রায়ের মনে তখন বোধ হয় ভাসমান খড়ের টুকুরোও অপরিসীম ভরসার সঞ্চার করতো।

কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডুর হাসির স্নিগ্ধতায় বললেন, "কাল থেকে মনটা বড়ো খারাপ হয়ে আছে। একটু বেড়াতে বেরুবেন এখন ? আমার তৈরী হতে দু'মিনিটের বেশি লাগবে না।"

উপায় ছিল না এমন অনুরোধ উপেক্ষা করবার। ইচ্ছাও ছিল না। মনে একেবারেই ভয় ছিল না বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি ভয় ছিল মিসেস রায়ের কাছে এবং নিজের কাছে ভীরু বলে প্রতিপন্ন হবার। ইতিহাসের বহু দুঃসাহসিক কীর্তির উৎস এমনি অবিমিশ্র ভীরুতা।

কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারাবৃত শীতল রাত্রির মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে কিছুই না জেনে অত্যন্ত অল্পপরিচিত দু'জন একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লেম দার্জিলিঙের জনহীন পথে।

কে জানে কি ছিল বিধাতার মনে।

আট

অন্ধকার শুধু আলোর অনুপস্থিতি, এই নঞর্থক ভ্রান্ত ধারণাটা বিজলী আলোর বিজ্ঞাপনের কল্যাণে আজ অত্যন্ত ব্যাপক। দিনের আলোর চাইতেও উজ্জ্বলতর রাত্রি সৃষ্টি করবার জন্যে প্রত্যহ উদ্ভাবিত হচ্ছে নব নব যান্ত্রিক ব্যবস্থা। নগরবাসী গ্রাম পরিভ্রমণে গিয়ে সব চাইতে সরবে যে অভি-যোগ করে থাকেন তা অন্ধকার নিয়ে। বর্তমানে পল্লী-উন্নয়নের জন্যে যে যে-পরিকল্পনা ভোট-চুম্বকের সম্মান লাভ করছে তার সবগুলিই মূলত পল্লী-উচ্ছেদ পরিকল্পনা। কেননা আদর্শ পল্লী বলে তাকেই বরণ করা হচ্ছে যার নগরের অনুকরণ সব চেয়ে বেশি, পল্লীর সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটুকু যেখান থেকে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই নয়া গ্রামগুলি ম্যালেরিয়াশূন্য হয়ে স্বাস্থ্যকর হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা গ্রাম থাকেনি। এরা যেন রাশিয়ার "নয়া ডিমক্রাসি," এমন নয়া যে গণতন্ত্রের বাষ্পমাত্র নেই সেখানে!

অন্ধকার আর আলোর মধ্যে এমন একটা অবাস্তব বিরোধের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয়েছে যে আজ 'সভ্যতার আলো' এবং 'কু-সংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন' ইত্যাদি কথাগুলির প্রচলন একান্তই স্বাভাবিক বলে পরিগণিত। আলো যেন সভ্যতারই প্রতীক, অন্ধকার যেন বর্বরতার নামান্তর।

পৃথিবীর প্রারম্ভের সঠিক বিবরণ আমার জানা নেই। কিন্তু সৌরমণ্ডলের সামগ্রিকতায় অন্ধকার যে একেবারে অস্বাভাবিক নয়, এ তথ্য আলোর উপাসকরাও অস্বীকার করবেন না। মানুষ একদিন মঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রহে অনায়াসে যাতায়াত করবে এমন সম্ভাবনাকে স্বপ্ন বলে অবজ্ঞা করিনে; কিন্তু সেখানে মানুষকে এই ক্ষুদ্রতম উপগ্রহ, পৃথিবী, থেকে আলো বহন করে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে পৌঁছে আলো মিলবে না কোথাও।

এই আলো পৃথিবীকে হয়তো শত-সহস্র গ্রহ-তারার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে, হয়তো করেনি। ইতিহাসের সর্বশেষ অধ্যায়ের সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছোবার আগে তার গ্রহণ-যোগ্য চরম প্রমাণ পাওয়া যাবে না। কিন্তু মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে প্রমিথিয়ুসকে পরম ব্রহ্ম বলে জ্ঞান করলে বাড়াবাড়ি হবে।

আলো যদি সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী বাহন হয়ে থাকে তাহোলে সে সভ্যতা একান্তই নাগরিক সভ্যতা, কেন না, ভারতীয় সভ্যতার জন্মস্থান যে-অরণ্য এবং পল্লী এবং পর্বত তার কোথাওই আলোর আধিক্য ছিল না এবং নেই।

দিনের আলোয় মানুষ কাজ করে, রাতের আঁধারে সে একা বসে ভাবে। পশ্চিমের কর্মসর্বস্ব সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেখানকার অধিবাসীদের অধ্যবসায়ের বলে, আমাদের ধ্যান-সর্বস্ব সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের চিন্তাশীলতার ফলে। ওদের সভ্যতাকে তাই বলা যায় দিনের সভ্যতা, আলোর সভ্যতা। আমাদের সভ্যতা রাত্রির, অন্ধকারের।

দিনের বেলায় মানুষ কর্মস্থলে একত্রিত হয়। একসঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ হয় অনেকের সঙ্গে। কিন্তু সেটা সাক্ষাৎই, মিলন নয়। দিনে তাই আমরা একত্রিত হলেও পরস্পরের কাছে বিচ্ছিন্ন। মিলনের ক্ষণ রাত্রি। দিনের বেলায় ট্রামে আপিস যাওয়ার সময় পুরো আধ ঘণ্টা যার পাশে বসে থাকি তার সঙ্গে সামান্যতম পরিচয়ও ঘটে না, পরিচয়ের ইচ্ছাও হয় না। কিন্তু অন্ধকারে পার্কের কোনো বেঞ্চিতে একান্ত আগন্তুকের সঙ্গেও আত্মীয়তা আছে বলে মনে হয়, আত্মীয়তা না থাকলেও তার সম্বন্ধে কৌতূহলের অন্ত থাকে না। দিনে আমরা সকলের, অর্থাৎ কারোই নই। সন্ধ্যার পরে আমরা আমাদের, কিম্বা বিশেষ কারো।

মিসেস্ রায়কে নিয়ে নিঃশব্দে পথ চলতে চলতে যেখানে গিয়ে বসলেম, সেটা জলাপাহাড়ে উঠবার পথে ক্লান্ত জনের বিশ্রামের জন্যে সরকারী একটা ঘর। তার মাথার উপর একটা ছাদ আছে, ভিতরে আছে গোটা দুই বেঞ্চি, কিন্তু দেয়াল বলতে কিছু নেই। ঠাণ্ডা হাওয়ার পথ একেবারেই অবারিত।

নগ্নদেহে শীতের সম্মুখীন হওয়া শাস্তি, কিন্তু পর্যাপ্ত আচ্ছাদন থাকলে শীতের মতো উপভোগ্য ঋতু আর নেই। তখন শুধু শীত বোধ না করারই আনন্দ নয়; এমন কি, শুধু শীত রোধ করার আনন্দও নয়। শীতকে জয় করার আনন্দ। সে আনন্দের আলাদা উত্তাপ আছে যা শীতকে শুধু সহনীয় করে না, রমণীয় করে।

একা পথ চলতে চলতে যদি কেউ নিজের মনে কথা কয়

তবে তার দ্বারা কথকের মানসিক অবস্থার অস্বাভাবিকতাই সূচিত হয়। কিন্তু জাগ্রৎ দু'জন ব্যক্তি যদি অনেকক্ষণ একটি মাত্র কথাও না বলে কেবলমাত্র চুপ করে স্থির হয়ে বসে থাকে, তাহলে সেটাও স্বাভাবিক নয়। আমি এবং মিসেস্ রায় যে সেই ছোট ঘরটায় এতক্ষণ নিঃশব্দে স্থির হয়ে বসেছিলেম সেটা এমনিতেই স্বাভাবিক নয়; আমাদের পরিচয়ের দৈর্ঘ্য বা গভীরতায় তার সমর্থন ছিল না। তার উপর কোনো কিছু বলতে বা শুনতে না পেরে আমার অস্বস্তির অবধি ছিল না।

বাক্য-বিনিময় হয়নি, কিন্তু তাই বলে আমরা দুজনে যে সম্পূর্ণ পৃথক এবং যোগাযোগের সকল সূত্রবিহীন বিভিন্ন দু'টি য়ুনিটরূপে বসেছিলেম তা নয়। ভাবের বিনিময় কি হয় শুধু মাত্র বাক্যের মাধ্যমে? এমন কি, কবি-কথিত আঙুলের স্পর্শ দিয়েও সেতু নির্মাণের প্রয়োজন হয় না সব সময়। দার্জিলিঙের অন্ধকারের অসাধারণ ক্ষমতা আছে কাছের প্রকৃতিকে দূরের মতো অদৃশ্য করবার এবং দূরের মানুষকে অনুভূতির অতি কাছে এনে দেবার।

সেই সন্ধ্যায় মিসেস্ রায়ের সঙ্গে অজানা অন্ধকারে বেড়াতে বেরিয়ে এবং পরে বিশ্রাম করতে বসে তাঁর সঙ্গে যে নিহিত ঐক্য অনুভব করেছিলেম তার সর্বাঙ্গীণ সন্তোষজনক কোনো সংজ্ঞা দিতে পারব না। কিন্তু কোনো প্রকার অন্তরঙ্গতা ব্যতিরেকেও আমাদের অপরিচয়ের সকল বাধা অতিক্রম করে সেদিন যে নিবিড় আত্মীয়তার পরিবেশ রচিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তা নইলে মিসেস্ রায় পারতেন না আমার মতো দক্ষিণাদাতা

অতিথির কাছে তাঁর জীবনের এত না-বলা কথা এমন নিঃসংকোচে প্রথম বারের জন্যে ব্যক্ত করতে, আমিও পারতেম না এমন সানুকম্প শ্রবণের মধ্য দিয়ে মিসেস বায়ের বিলাপ আর অভিযোগের পরোক্ষ সমর্থন জানাতে।

অনেকক্ষণ পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ্যে অতিবাহিত হলে মিসেস্ রায় প্রায় অশ্রুত কণ্ঠে বললেন, "কী, একেবারে চুপ ক'রে আছেন যে, কী ভাবছেন ?"

অনেক কিছু ভাবছিলেম অস্পষ্ট ভাবে, তার একটারও প্রকাশযোগ্য নির্দ্দিষ্ট রূপ ছিল না। রায় বা মিসেস্ রায় কারো সম্বন্ধেই কিছু জানিনে। দাম্পত্য-পরিস্থিতি এমনিতেই বাইরের লোকের কাছে দুর্বোধ। বন্ধু হিসাবে যাকে বহু দিন থেকে জানি, স্বামী হিসাবে তার স্বরূপের কিছুই না জানতে পারি। সরাই-রক্ষয়িত্রীরূপে যে মহিলার দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি, মিসেস্ রায় হিসাবে তার পরিচয় একেবারেই বিভিন্ন হতে পারে। স্ত্রী-সম্মুখীন রায়ের ভীরুতা দেখে যাকে নিরীহ বেচারী বলে মনে করেছি, তার কতটুকু পরিচয়ই বা পেয়েছি অতটুকু দেখার মধ্যে ? রায় কেন ছিল তা-ও জানিনে, কেন চলে গেছে তা-ও জানিনে। এমন বৃহৎ অজ্ঞতা নিয়ে বিমূঢ় বোধ করতে পারি, কিন্তু বলব কী ? তাই মিসেস্ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে বললেম, "তেমন কিছু ভাবছিনে।" অন্য কথা তুলতে চেষ্টা করে যোগ করলেম, "ভীষণ শীত, না ?"

"না তো। আমার তেমন ঠাণ্ডা লাগছে না তো।"

"বলেন কি !"

"সত্যি, আমার আর দার্জিলিঙের শীতকে শীত বলেই মনে হয় না।"

অবিশ্বাস গোপন না করে বললেম, "শীতে লোকে দার্জিলিঙ থেকে নীচে নামে, আপনার ইচ্ছে বুঝি ফালুৎ ওঠবার ?"

পরিহাস উপেক্ষা করে মিসেস্ রায় কঠোর ভাবে বললেন, "হয়তো কালই সেখানে যেতে হবে। আরেকটু পরেই জানতে পারব।"

আমি কিছুই বুঝলেম না। আবার চুপ করে রইলেম। ঘোর অন্ধকারকে এমনিতেই বোঝার মত মনে হয়। তার উপর নৈঃশব্দ্য বিরাজ করতে থাকলে তা বহন করা আরো দুরূহ হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ আগে মিসেস্ রায় যখন কী ভাবছি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন জানতেম যে আমরা দু'জনেই একই কথা ভাবছিলেম, রায়ের কথা। কিন্তু আমার সে কথা উল্লেখ করবার উপায় ছিল না। অপেক্ষা করছিলেম মিসেস্ রায়ের নিজে থেকে কিছু বলার জন্যে। তিনিও বোধ হয় আমার স্বল্পভাষিতায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন। সুযোগ মিলল ফালুতের উল্লেখে। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, রায়কে আপনি কত দিন থেকে জানেন ?"

"আপনাকে যতদিন থেকে জানি ঠিক তত দিন থেকে, সাত দিন আগে দার্জিলিঙে আসার পূর্ব্বে তাঁকে কখনো দেখিনি।"

"বা রে, তাহোলে আমাদের ওখানে উঠলেন কী করে ? আমাদের ওই জায়গাটার নাম তো বিশেষ কেউ জানে না।

"আমিও জানতেম না। আমার এক বন্ধু এসে গত অক্টোবরে আপনাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনিই কাঞ্চনজংঘার ঠিকানা দিয়েছিলেন।"

"তাই না কি। আমার সম্বন্ধে কিছু বলেননি আপনার বন্ধু ?"

"প্রচুর সুখ্যাতি করেছেন।"

"আর ?"

"তা ছাড়া কিছু বলেন নি তো।"

মিসেস রায়ের সন্দিগ্ধতায় সন্দেহ হোলো আপন স্মৃতি-শক্তির উপর। যা মনে পড়ল তা উল্লেখযোগ্য নয়। জিজ্ঞাসা করলেম, "কেন, আর কী বলার আছে ?"

"অনেক, অনেক আছে! সত্যি, মিথ্যে···"

"আমার বন্ধুর ভদ্রতাবোধ সম্বন্ধে আপনার খুব শ্রদ্ধা নেই দেখছি।"

"কারো ভদ্রতা সম্বন্ধেই আর শ্রদ্ধা নেই, শুধু আপনার বন্ধুর নয়।"

মিসেস্ রায়ের উক্তিতে প্রেজেণ্ট কম্প্যানি বাদ দেয়া ছিল কি না জানিনে। কিন্তু কথাটা শুনতে ভালো লাগল না। বিরক্তি গোপন করে বললেম, "তার চেয়ে বলুন ফালুং যাচ্ছেন কেন ?"

"আমার বাড়ি, লোকজন সবাই যে সেখানে।" হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনে সচকিত হয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন মিসেস্ রায়। কাউকে না দেখতে পেয়ে অধৈর্যসূচক স্বরে বললেন, "এত দেরী হওয়ার তো কথা নয়!"

আমি ভাবলেম বুঝি রায়ের কথা বলছেন। আশ্বস্তির স্বরে জিজ্ঞসা করলেম, "মিস্টার রায়ের এখানে আসবার কথা আছে বুঝি?"

"না-না-না—, রায় নয়, মিসেস রায় অন্ধকারের বুক চিরে প্রায় কেঁদে উঠলেন, "রায়ের কথা বলছিনে। ফালুতে যাকে খবর আনতে পাঠিয়েছি তার আসবার কথা। রায়কে আর আসতে হবে না।"

আমি আবার চুপ। অন্ধকারে মিসেস্ রায়কে ভালো করে দেখবার উপায় ছিল না কিন্তু বুঝতে বাকী রইল না যে তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত। প্রভাতের বিস্ফারণের পরে অপরাহ্লে যে করুণ শান্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেম তা যে একেবারেই অস্থায়ী তাতে আর সন্দেহ ছিল না। মিসেস রায়ের সশব্দ নিশ্বাস-প্রশ্বাসে শান্তির আশ্বাস ছিল না একতটুকুও বরং অদৃশ্য সর্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তা! আমার দুশ্চিন্তা যে স্বার্থলেশশূন্য ভাবে কেবল মাত্র রায়ের নিরাপত্তার জন্যেই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তা নয়। গভীর উদ্বেগ গোপন করে বললেম, "এবারে বাড়ি ফেরা যাক। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।"—যদিও ওভারকোটের তলায় ঘামছিলেম।

আমি উঠবার নাম করতেই মিসেস্ রায়ের প্রজ্বলিত রোষ কেন জানি না নিমেষে নির্বাপিত হয়ে গেল। আবার সেই বিকালের অসহায় স্বরে বললেন, "আমাকে সেই লোকটার জন্যে এখানে অপেক্ষা করতেই হবে। আপনি আর একটু বসবেন না—আমার জন্যে?"

বৈশাখের ঝড়, জ্যৈষ্ঠের বিদ্যুৎ এবং আষাঢ়ের বর্ষণ—এই তিনের ত্বরিত পরিবর্তন—যা প্রায় যুগপৎ ঘটছিল বলে মনে হচ্ছিল, একই নারীর মধ্যে, মাত্র একটি দিনের পরিসরে এমন স্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ করে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কোনটি আসল মিসেস্ রায়? যিনি রায়ের নামের সামান্যতম উল্লেখে অবর্ণনীয় উত্তেজনা গোপন করতে পারছেন না, না যিনি রায়ের আকস্মিক অন্তর্ধানে অবিন্যস্ত কেশরাশি পিঠের পরে ছড়িয়ে আজ সকালে আমার ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, না যিনি এক মুহূর্ত পূর্বে অসহায় শিশুর মতো আমাকে থাকতে মিনতি করছিলেন?

আমি মিসেস্ রায়ের অনুরোধ অনুযায়ী অপেক্ষা করতে থাকলেম। হিম শীতল দেহ এবং উত্তপ্ত অতৃপ্ত কৌতূহল আর বাধা মানল না! বললেম, "বলছিলেন যে আমার বন্ধুর অনেক কিছু বলবার ছিল। কী বলুন তো?"

"এতক্ষণ আপনার এই প্রশ্নেরই জন্যে অপেক্ষা করছিলেম; গভীর দুঃখের সময় কোনো কাউকে বিশ্বাস করে দুঃখের কাহিনী না বলতে পারায় দুঃখ যে কত বেশি গভীর হয়ে বাজে জানেন না আপনি। আপনার সঙ্গে আজ বেড়াতে বেরিয়েছিলেম এই ভেবে যে যে-কথা আগে কাউকে বলিনি আজ তাই বলব আপনাকে। ভেবেছিলেম বাক্যের অপব্যয়ে হয়তো লাঘব হবে হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনার।"

মিসেস্ রায়ের দীর্ঘশ্বাসের জন্যে বিরতির সুযোগে বললেম, "যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, আপনার বাক্য অপব্যয়িত

নয়, অপরূপ ভাষা-মাধুর্যে তা সমৃদ্ধতর হয় মাত্র।" মিসেস্ রায় বোধ হয় আমার কথা শুনতেও পেলেন না।

"সেই এখানে এসে বসা থেকেই বলবার চেষ্টা করছি। এক দিকে আপন সংকোচ, অপর দিকে আপনার অকৌতূহল, তাই বলা আর হয়নি।"

"আপনার রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে বলতেম, 'শোনোনি কি জননীর অন্তরের কথা'।"

মৃদু, প্রায় অদৃশ্য-অশ্রুত হাস্যে মিসেস্ রায় বললেন, "হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ পূরোপূরি ভুলিনি এখনো।" একটু পরে বললেন, "আচ্ছা, আমার বাঙলার প্রশংসা করছিলেন না আপনি একটু আগে?"

"হ্যাঁ এবং আবার করতে যাচ্ছিলেম।"

"কখনো আর কিছু মনে হয়নি আপনার? একটু অদ্ভুত, একটু অসমঞ্জস?"

বন্ধুর দু'-একটা হাস্যকর ইঙ্গিতের কথা অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ল, মনে এলো চিরুণী-কাংগোর কথা, কিন্তু বললেম, "আর মনে হয়েছে আপনার নেপালী ভাষায় সমান দক্ষতার কথা।"

"এই দেখুন, না জেনে একটা রায় দিয়ে বসলেন। আপনি তো নেপালী ভাষার কিছুই জানেন না। কী করে বুঝলেন ও ভাষা আমি ভালো বলি?"

নিন্দা করলে জেরা হয় জানি, প্রশংসা তো লোকে অসত্য হলেও নির্বিবাদে মেনে নেয়! কিন্তু মিসেস্ রায় প্রশংসার কথা ভাবছিলেনই না।

আমি ইতস্তত করে বললেম, "আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না, কিন্তু তাই বলে আপনার বাঙলার আন্তরিক প্রশংসাকে কপট স্তুতি বলে মনে করবেন না যেন।"

"অথচ বাঙ্গালীই নই আমি!" মিসেস্ রায় সশব্দে হেসে উঠলেন।

"বাঙালী ন'ন!" মিসেস্ রায় যদি বলতেন সামনে হিমালয় নেই, যদি বলতেন আমি দার্জিলিঙে নেই, যদি বলতেন তিনি আমার সঙ্গে একই বেঞ্চিতে বসে নেই, তাহোলেও এমন অবাক হতেম না।

"না, জন্ম দ্বারাও নয় বিবাহসূত্রেও নয়, হা—হা।" মিসেস্ রায়ের উচ্চহাস্যে শুধু উপহাস বা পরিহাস ছিল না। অনির্দেশ্য আরো কিছু!

আমি হতবুদ্ধিতা সম্বরণ করে বললেম, "তাহোলে রায়ও বাঙালী নয়?"

"রায় বাঙালী, অতএব···?"

"অতএব?" আমার প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু করবার শক্তি ছিল না।

"নাঃ আপনার কলেজে-পড়া লজিক দেখি একেবারেই ভুলেছেন। প্রোসেস্ অব এলিমিনেশন করলে কী থাকে?"

এবারে বুঝতে দেরী হোলো না। কিন্তু কিছু বলতে পারলেম না। আবার অসহ্য নৈঃশব্দ এলো। চুপ করে থাকা সোনার মতো দামী হতে পারে, কিন্তু সে যে কখনো-কখনো লোহার চেয়েও ভারী হতে পারে প্রবাদে তার উল্লেখ নেই।

"কিছু বললেন না যে?" মিসেস্ রায়ের কম্পিত কণ্ঠে অশ্রুর আভাস ছিল নির্ভুল, "ঘৃণা বুঝি নির্বাক করেছে?"

"না মিসেস্ রায়, আমার সকল ঘৃণা নিজেরই পরে নিঃশেষিত হয়ে গেছে আর কারো জন্যে অবশিষ্ট নেই এক কণাও।"

"কিন্তু সবটা না জেনে ফাঁসির হুকুম দেবেন না।"

"আমি ফাঁসির হুকুম দিলেও তা তলব করার মতো কেউ নেই, অতএব সে ভয় করবেন না।"

"না, ভয় কাউকেই করি নে! ও-বস্তুটি, আপনারই ভাষায়, বিধাতা বাঙালীদের এমন নিঃশেষে দান করেছেন যে অ-বাঙালীদের জন্যে কিছুই বাকী থাকেনি। তবে কি না..."

মিসেস্ রায় আরেক বার কী একটা শব্দ শুনে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কেউ আসছে কি না। কাউকে না দেখতে পেয়ে আবার সুরু করলেন।

"তবে কি না, যে যাই বলুক, কেউ—সে যেই হোক না কেন, অপরিচিত, অক্ষম, অধম বা নগণ্য—কেউ আমার সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাবছে এটা কারোই ভালো লাগে না।"

নানা দার্শনিকতায় ভূমিকা কেবলি দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হচ্ছিল।

প্রশ্নটার অশোভনতা সত্বেও বললেম, "তার চেয়ে ভালো লাগার কথা বলুন। রায়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় হোলো কবে বা কী করে।"

মিসেস রায় দোষ নিলেন না, বললেন, "তার আগে

আমার কথা বলি। জন্ম হয়েছিল সভ্য লোকালয়ের বাইরে ফালুতের ডাক-বাংলোর কাছে। মা-বাবা কেউ কখনো ফালুৎ থেকে নীচে নামেননি। তাই তাঁদের নীচের সমতল দেশের সভ্যতর সমাজ সম্বন্ধে ছিল অপরিসীম ভীতি এবং তার চেয়েও বেশি অজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা। আমার বয়স যখন বছর পাঁচেক, তখন কী একটা লটারিতে যেন বাবা অনেকগুলি টাকা পেয়ে গেলেন। অত টাকার সঞ্চয় বা ব্যয়ের পরিকল্পনা তো দূরের কথা, তার পরিমাণ কল্পনা করাও ছিল তাঁর সাধ্যাতীত। গ্যাংটকের মিশনারী সাহেব—আসলে তাঁর নামেই টিকিটটা কেনা হয়েছিল—তিনি যখন বাবাকে পুরস্কারের প্রাপ্য টাকার অংকটা বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন তখনই বাবা আনন্দাতিশয্যে হার্ট ফেল করে মারা যান!"

আমি দুঃখ জ্ঞাপন করে বললেম, "আপনার মা?"

"তিনি আমার জন্মের পরেই মারা যান। বাবার মৃত্যুর পরে সেই মিশনারী সায়েব আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কার্শিয়ঙে মিশনারী ইস্কুলে, অভিভাবক আর একসিকিউটর করে দিলেন একটা ব্যাংককে। সেখানে থেকে সীনিয়র কেমব্রিজ পাশ করবার আগেই চলে যাই শান্তিনিকেতনে। সেখানে ছিলেম তিন বছর, বাবার টাকার উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ না করা পর্যন্ত।"

"তাই বলুন। এবারে বুঝতে পারছি আপনি কোথায় এমন সুন্দর বাঙলা বলতে শিখেছেন।"

"কিন্তু আমার ভাষা-পারদর্শিতার কারণ বলতে এত কথা

বলছি নে আপনাকে। শান্তিনিকেতনে শুধু বাঙলাই শিখিনি, গানও শিখেছিলেম। তার চেয়েও বেশি শিখেছিলেম গানকে ভালোবাসতে।”

“অস্কার ওয়াইল্ডের কিন্তু একটা এপিগ্রাম আছে যে মেয়েরা গানকে কখনোই ভালোবাসে না, ভালোবাসে গায়ককে।” গুরু আলোচনায় লঘু তরলতার সুর আনতে চেষ্টা করলেম। চেষ্টাটা ভয়ানক রকম সফল হোলো না।

“মিথ্যে কথা। তখন গানকেই ভালোবেসেছিলেম। কিন্তু যাক সে কথা। চেক সই করবার ক্ষমতা পাওয়ার পরেই মনে পড়ল দেশের কথা। ভাবলেম, যাই একবার দেখে আসি গাঁয়ের আপনার লোকজনদের—সফল পুরুষ যেমন বিজয় গৌরবে বার্মা বা বিলেত থেকে ফেরে। সে নৈরাশ্যের কথা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। বাঙলা দেশে এসে পরকে আপন করতে পারিনি, দেশে এসে আপনকে মনে হোলো নিতান্ত পর বলে। ফিরে এলেম মাঝামাঝি জায়গায়—দার্জিলিঙে, যা কিছু বাঙলা, কিছু নেপাল, কিছু ভুটান।”

একটু হেসে মিসেস্ রায় স্থির, অকম্পিত কণ্ঠে বলে চললেন “এমনি মিশ্রিত একটা জায়গাতে এক রকম কেটে যাচ্ছিল কিন্তু বড়ো নিঃসঙ্গ বোধ করছিলেম।”

“কম্পোজিট জায়গা যদি বা মেলে, কম্পোজিট মানুষ পাওয়া শক্ত।” আমি মিসেস্ রায়ের কাহিনী সংক্ষেপ করবার সুযোগ দিলেম।

“যে হোটেলে ছিলেম তার ম্যানেজার ছিল রায়। একা

একটা ঘর নিয়ে একটি মহিলা মাসের পর মাস কোনো সহজ প্রত্যক্ষ কারণ বাদেই থেকে যাচ্ছে এতে আর সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমি তা উপেক্ষা করেছিলেম অনায়াসেই। রায়ের সঙ্গেও দু'চার বার যা কথা হয়েছিল তা ম্যানেজার হিসাবেই। হঠাৎ একদিন...”

আমি বাধা দিয়ে বললেম, “মাপ করবেন, কিন্তু রায়কে তো কখনোই একটা কম্পোজিট চরিত্রের লোক বলে মনে হয়নি আমার।”

“আজ আর তা কারোই মনে হবে না। কেউ বিশ্বাসও করবে না। কিন্তু সেদিন রাত্রে রায় যখন আপন মনে নিজের ঘরে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিল, সেদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর গুন্ গুন্ করছিলেম না, বৈষ্ণব পদাবলীই সেদিন আমার কথা বলছিল। পাঁচ বছর আগের কথা এটা। তখনকার রায়ের সঙ্গে আজকের রায়ের এতটুকু সাদৃশ্য নেই। পুরুষ এতও বদলাতে পারে!”

শুধু পুরুষ বদলায় না, বদলায় সবাই। যত বিরোধ, যত বিচ্ছেদ, যত বেদনা, সে তো পরিবর্তন নিয়ে নয়; পরিবর্তনের গতি এবং বেগ নিয়ে। রায়ের মতো মিসেস্ রায়ও নিশ্চয়ই পাঁচবছর আগেকার মিসেস্ রায় নেই। তাঁরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ট্র্যাজেডি এটা নয় যে দু'জনেই বদলেছে। ট্র্যাজেডি এই যে উভয়ের পরিবর্তন সমান্তরাল গতিতে হয়নি, সমান তালে চলেনি। এক জনের আকর্ষণ যখন বেড়েছে, অপরের কমেছে। একের কমলে

অপর পক্ষের বেড়েছে। ঘনিষ্ঠতার প্রথম কয়েকটা মুখর সন্ধ্যার কথা বাদ দিলে, নর-নারীর প্রেমের নক্ষত্রলোকে নিয়তই এই পরিবর্তন চলেছে—একের মিলন-পিপাসা যখন শুক্লপক্ষের শশিকলার মতো কেবলি বৃদ্ধি পেতে থাকে, অপরের তখন কৃষ্ণপক্ষ, সেখানে গতি হ্রাসের দিকে, হ্রাস থেকে গ্রাসের দিকে।

কিন্তু এসব কথা তখন মিসেস্ রায়কে বলতে যাওয়া বৃথা। দর্শকের পক্ষেই দার্শনিক নির্লিপ্ততা সম্ভব। অনাহত বিচারকের পক্ষেই সম্ভব সাক্ষ্য আর প্রমাণের নির্ভুল, নিরপেক্ষ নিক্তির ওজন করা। যে আঘাত পেয়েছে, যার উপর অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার বিচারের মান আলাদা হবেই। অন্যরূপ আশা করাই অন্যায়।

মিসেস্ রায় একটু থেমে নীরবে অশ্রুমোচন করে পুনরায় কাহিনীর বিবৃতি সুরু করলেন। পাঁচ বছর আগেকার প্রাণবন্ত আনন্দমুখর মুহূর্তগুলি মরে গেছে বহু দিন আগে। আজ তাদের স্মৃতিমন্থনে আনন্দের লেশ মাত্র নেই। আছে শুধু তিক্ততা, বিদ্বেষ, আর আপন নির্বুদ্ধিতায় অপরিসীম অনুতাপ।

"রায় তখন সত্যি ভালো বাঁশি বাজাতে পারতো। আমার যেটা সব চাইতে ভালো লেগেছিল সেদিন তা হচ্ছে এই যে ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর বাজাতো। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তখনো পংকজ মল্লিকের কল্যাণে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি—তাঁর গান তখনো নিবদ্ধ ছিল বোলপুরের আশ্রমে আর বালিগঞ্জের দু'-একটা বসবার ঘরে। রায় দূরে বাঁশিতে সুরটা বাজাতো,

আমি মনে-মনে গুন্ গুন্ করতেম কথাগুলো নিয়ে। সঙ্গীত যেমন করে ব্যবধানের অবসান ঘটাতে পারে এমন আর কিছু পারে না। গায়ক আর শ্রোতা তাদের পৃথক সত্ত্বা হারিয়ে ফেলে এক হয়ে যায় সঙ্গীতের মূর্ছনায়। তাই রায়ের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার অবিশ্বাস্য রকম অল্প সময়ের মধ্যে দু'জনে দু'জনকে জানলেম অসীম ত্রস্ততায়। অসীম গভীরতায় যে নয় সে কথা আজ জানি।"

"জানার কি শেষ আছে মিসেস্ রায় ? মরবার পূর্ব মুহূর্তেও বলবার উপায় নেই যে একটি লোকের সম্বন্ধেও চরম জানা জেনেছি।"

"কিন্তু না-জানা নিয়ে রসায়নাগারে গবেষণা চলে, বাঁচা চলে না। বাঁচবার জন্যে কোনো একটা মুহূর্তের জানাকে চরম বলে মানতেই হয়। এবং সেই জানা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। কিন্তু সে কথায় পরে আসছি। এমন শীত ছিল একদিন, কিন্তু এমন অন্ধকার ছিল না। আমি আর রায় বসেছিলেম অবজার্ভেটরির কাছে আমাদের একটা প্রিয় জায়গায়।

"আজো কানে বাজছে, রায় সেদিন রবীন্দ্রনাথের সেই করুণ সুরে 'আমার জীবন-পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—তুমি জান নাই তুমি জান নাই তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ' এই গানটার সুর বাজিয়েছিল। বুঝতে বাকী ছিল না যে এ ওরই মনের কথা। আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। তার পরে যা হয়েছিল তা বলতে গেলে আজ আমার কাছে মনে হবে নিষ্ঠুর পরিহাস বলে, আপনার কাছে মনে হবে

সাধারণ প্রেমের গল্প বলে। যদিও আমার কাছে তা আদৌ সাধারণ ছিল না। যাক্ সে কথা।

"ডিসেম্বরের দার্জিলিঙেও সেবার অনেক লোক, সবই প্রায় খাকি। রায়ের হোটেলে এত খাকির ভীড় আমার ভালো লাগত না। তাই তখন এই 'কাঞ্চনজংঘা' বাংলোটা কিনে সেখানে চলে এলেম। রায়ের হোটেলে কাজ ছিল ভয়ানক, কিন্তু কাজে মন ছিল না তেমন। বেশির ভাগ সময় কাটতো আমার বাড়িতে। হোটেলের মাড়োয়ারি মালিক এক দিন রায়কে একটু জোরেই বোধ হয় ধমকেছিল এই নিয়ে। রায় সন্ধ্যা বেলা মুখ ভার করে আমার কাছে এসে বলল, 'এই যুদ্ধের সময় এত লোক ব্যবসা করে এত টাকা করছে, আর আমি মরছি সামান্য মাইনের চাকরি করে ধমক খেয়ে। সামান্য মূলধন নেই বলে'।

"সামান্য মূলধন কেন, আমার সমস্ত টাকা, সমস্ত গয়না সেদিন হাসিমুখে রায়ের হাতে তুলে দিতে পারতেম। কিন্তু যুদ্ধের ব্যবসায় আমার মত ছিল না। তাছাড়া রায় যে ব্যবসায় কিছু করতে পারবে তা বিশ্বাস করিনি। যার অন্তর থেকে উদ্ভূত হাওয়ায় অমন স্বর্গীয় বাঁশি বাজে, সে-মনে ব্যবসায়িক কূটবুদ্ধির বা নীচতার স্থান কোথায়? আমি তাই রাজী হইনি, বলেছিলেম, 'ব্যবসা তোমার জন্যে নয়। তুমি শিল্পী। ব্যবসার কথা ভেবো না।'

"ব্যবসার কথা ভাবেনি আর, কিন্তু চাকরিতেও মন ছিল না। চুয়াল্লিশের মাঝামাঝি, জুন মাসেই, একদিন হঠাৎ দুপুর

বেলা ও এসে বলল, ‘আজ আবার মাড়োয়ারিটা এসেছিল ধমকাতে—কাল সেই পাঁচ মিনিটের জন্যে একবার হোটেল ছেড়ে তোমার কাছে এসেছিলেম না?—সেই জন্যে। আজ আর ভালো লাগল না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি।’

“চাকরিটা এমন কিছু একটা বিরাট চাকরি ছিল না, কিন্তু ওর আর কেউ নেই, হাতেও এক পয়সা নেই, তাই জন্যেই চাকরি ছাড়াতে আমি খুশি হইনি। কিন্তু কিছু বলিনি আমি। কাজ ছেড়ে দিয়ে ও কোথায় ছিল, কী করতো আমি জানতেম না। সন্ধ্যা বেলা আসতো প্রায়ই বাঁশি শোনাতে, কিন্তু ঠিকানা বা কাজের কথা জিগেস্ করলে অসন্তুষ্ট হতো। বুঝতে পারতেম যে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিন চলছে ওর, কিন্তু আমাকে বলতো না কিছু। বুঝি পৌরুষে বাধতো। আমারও মন চাইতো না এমন প্রিয়জনকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে অপমান করতে।

“একদিন বাঁশি বাজাতে বাজাতে হঠাৎ ভয়ানক রকম কেসে উঠল। সে কাসির আওয়াজে যেন শ্মশানের কান্না ছিল। আমি বাঁশি সরিয়ে রেখে শুইয়ে দিলেম আমার বিছানার উপর। কপালে হাত দিয়ে দেখি ভীষণ গরম। ডাক্তার ডাকলেম, সেবা করলেম। সেরে উঠে সুস্থ হয়ে কর্মক্ষম হতে প্রায় তিন মাস লাগল। তার পর বাড়ি ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না, কেন না, বাড়ি বলতে কিছু ছিল না রায়ের। শরীর তখনো বেশ দুর্বল ছিল।

“একদিন বলল, ‘এবার আমি যাবো।’ আমি জিগ্যেস

করলেম, কোথায় ? আমার থাকতে বলার উপায় ছিল না। এরই মধ্যে ফালুতের মোড়লদের মধ্যে আমার বাড়িতে রায়ের থাকা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল বলে শুনেছিলেম। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তরে রায় যখন করুণ ভাবে আমার দিকে চেয়ে চুপ করে রইল তখন কিছুতেই পারলেম না ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে। ও থেকে গেল। কেন না, যাওয়ার জায়গা ছিল না।

"কেবল মাত্র বাঁশি বাজিয়ে আমার ঋণ শুধবে, সেইটেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হোতো। কিন্তু পুরুষের স্থূল মন বুঝবে কোত্থেকে অমন সূক্ষ্ম দেনা-পাওনা ? রায় চাইল ঐশ্বর্য দিয়ে সমৃদ্ধি দিয়ে আমার দ্বিধা ভাঙতে, সংকোচ জয় করতে। একদিন বলল, 'কাঞ্চি, যদি কিছু টাকা ধার দাও তাহোলে ক্যান্টিনে একটা সাপ্লাইয়ের কনট্রাক্ট্ পেতে পারি। খুব লাভ। অবিশ্যি এখনি একসঙ্গে সব টাকাটা দিতে হবে না। আপাতত হাজার পাঁচেক পেলেই সুরু করতে পারি।'

"কোনো প্রশ্ন করিনি। পরের দিন সকালে ব্যাংক থেকে পাঁচ হাজার তুলে দিয়েছি। পরে আরো। কিন্তু যুদ্ধ তখন প্রায় শেষ হতে চলেছে। সরকারের বহু চর তখন চুরি ধরবার কাজে নিযুক্ত। যুদ্ধের কন্‌ট্রাক্ট তখন আর দু'টাকার জিনিষ দিয়ে (বা না দিয়ে) দু'শো টাকার বিল পাস করানো নয়। বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা তখন লাভ নিয়ে সরে গেছে, লোভী মূর্খরা শেষে এসেছে ক্ষতি কুড়োতে। রায় হোলো তাদেরই এক জন। যুদ্ধ যেদিন থামল সেদিন রায়ের কন্‌ট্রাক্টও শেষ হোলো—কিন্তু

আমাকে শেষ করার আগে নয়। আমার সঞ্চিত অর্থের আর হাজার তিনেকের বেশি অবশিষ্ট ছিল না।

"আমার রবীন্দ্র-সঙ্গীত আর রায়ের বাঁশি, দুই-ই তখন চুলোয় গেছে। আমাদের আলোচনার বিষয় তখন কালের যাত্রার ধ্বনি নয়, কালকের বাজার। গুরুদেবের ভাষায় জীবন নয়, জীবিকা। টাকার যা সামান্য অবশিষ্ট ছিল, তাই নিয়ে আমিই তখন এই কাঞ্চনজংঘায় ছোট্টো-খাটো একটা বোর্ডিং-হাউস সুরু করলেম। দেখা-শোনা সব আমিই করি, কিন্তু রায়কে সামনে রেখে, নইলে সম্ভ্রান্ত অতিথিরা আসতে ভয় পায়।"

"আপনি এত করলেন ওর জন্যে আর রায় তার পরে আপনাকেই এমন ভাবে ফেলে চলে গেল?" আমি সমবেদনা না জানিয়ে পারলেম না।

"এই প্রথম নয়। ফালুতের কাছাকাছি একটা জায়গায় ড্যানডুপ বলে একটা জংলী ভুটিয়া মেয়ে আছে। আমি মাস ছয়েক আগে প্রথম জানতে পারি যে রায়ের সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ। সেই থেকেই রায় কী একটা ব্যবসার কাজে কলকাতা যাওয়ার কথা প্রায়ই আমায় বলে। আমি জানতেম সবই, কিন্তু কিছু বলিওনি, যেতেও দিইনি।"

"আপনার এখনো এই অকৃতজ্ঞ লোকটার জন্যে মমত্ববোধ আছে দেখছি।" আমি রায়ের সম্বন্ধে অযাচিত মন্তব্য না করে পারলেম না।

"না, মমতাই নয় শুধু, প্রয়োজনও ছিল। রায় চলে গেলে

আমার বাঁচারই উপায় থাকতো না। কাঞ্চনজংঘা বন্ধ করে দিতে হোতো তখনি। তাছাড়া, কাউকে মুখ দেখাতে পারতেম না। স্বামী-পরিত্যক্তার জন্যে লোকের করুণা হয়। কিন্তু রায় তো আমার স্বামী নয়, প্রণয়ী। সে ছেড়ে গেলে ধিক্কার, উপহাস ছাড়া আর কিছু জোটে না কোনো মেয়ের। সে উপহাস আমি সইব না কোনো মতেই। আমার সব গেছে, কিন্তু শেষ গর্বটুকু খোয়াতে পারব না। হার মানতে পারব না ওই অশিক্ষিত, অসভ্য, জংলী একটা স্বজাতীয়ার কাছে। তাই শেষ পর্যন্ত…”

মিসেস্ রায় হঠাৎ আবার একটা শব্দ শুনে কথা থামিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। অন্ধকারে আমি কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেম না। অন্ধকারের মধ্য থেকে, প্রায় শূন্য থেকে একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলো। মিসেস রায় তৎক্ষণাৎ উঠে একটু দূরে গিয়ে সেই লোকটির সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন। লোকটা আবার অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

মিসেস্ রায় ফিরে এসে বসলেন না আর। বললেন, “আপনাকে অনেকক্ষণ রেখেছি, অনেক বাজে কথা বলে বিরক্ত করেছি। এবারে বাড়ি চলুন, আর কিছু বলে আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। আর কিছু বলবার নেইও অবিশ্যি।” স্বরে নিশ্চিত আশ্বাসের সুর।

অন্ধকার থেকে আবির্ভূত লোকটার সঙ্গে শ্রীমতী কাঞ্চির কী কথা হয়েছে শুনিনি, যা শুনেছি তার এক বর্ণও বুঝতে

পারিনি। হঠাৎ কণ্ঠে আশ্বাসের সুরের কী কারণ হতে পারে, তাও ভেবে পেলেম না। আমার মনে শুধু ধ্বনিত হতে থাকল কৃতঘ্ন রায়ের জন্যে অন্তহীন ঘৃণা আর মিসেস্ রায়ের জন্যে অপরিসীম শ্রদ্ধা-মিশ্রিত করুণা।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ মিসেস্ রায় রীতিমতো জোরে হেসে উঠলেন। আমি চমকে উঠলেম ভয়ে আর বিস্ময়ে। সে-হাসি চারিদিকের অসংখ্য তরুরাজির মধ্যে তার অজ্ঞেয়তা ছড়িয়ে দিল। আমি কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেম, "কী, হঠাৎ এমন জোরে হেসে উঠলেন যে?"

"খুব জোরে হয়ে গেছে না? বড়ো অভদ্র, না?" হাসি কিন্তু থামল না, বা কমল না। হিস্টিরিক হাসির মধ্যে আবার বললেন, "আপনার ভদ্র বাঙালী মেয়েরা এমন হাসতো না, না? কিন্তু ভুলবেন না, আমি বাঙালী নই। রায় এই সহজ কথাটা ভুলেছে বলেই না ওর আজ এই বিপদ।"

"কী বিপদ আবার?" স্বতই এই সভয় প্রশ্নটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

"বিশেষ কিছু হয়নি এখনো তবে···"

"তবে কী?" আমি অপেক্ষা করতে পারছিলেম না।

"ভয় পাবেন না। ওই লোকটি এসেছিল দেখলেন না? ও সব ঠিক করে দিয়েছে। আমারও, আপনারও।"

"আমার কী করেছে আবার?" আমার ভয়ের শেষ ছিল না।

"আপনার জিনিষ-পত্তর সরিয়ে দিয়েছে অন্য একটা হোটেলে। সেখানে আপনি নিরাপদ থাকবেন!"

বিপদ কেটে গেলে বীরত্ব দেখাতে বাধা নেই। বললেম, "আমার নিরাপত্তার জন্যে ওর সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আপনার কী করেছে?"

"আমার যা করবার আমিই করব। ওকে শুধু ব্যবস্থা করতে বলেছিলেম। তা ও করেছে। বাকীটা নিজের হাতে করতে হবে। অন্যের কানে গান শোনা কি গান শোনা? তেমনি আরো কতগুলি কাজ আছে যা নিজে হাতে না করলে করাই নয়।" আবার সেই হাসি, কণ্ঠে সকালের সেই অস্বাভাবিক দৃঢ়তার স্বর।

"রায়কে একদিন সত্যি ভালোবাসতেম। রায়ও আমাকে সত্যি ভালোবাসত। রায় যখন আমার টাকায় ব্যবসা করে লোকসান করতে থাকল, তখন থেকেই সব কিছুব পরিবর্তন হতে থাকল। ক্রমে জানলেম যে আমার সব টাকা ব্যবসায়ও যায়নি, অনেকটা গেছে ছ্যানত্বপের ভরণ-পোষণে। উঃ, সে কী অসহ্য যন্ত্রণা, আপনি জানেন না। একমাত্র পুরুষরাই পারে এমন হৃদয়হীন ভাবে অকৃতজ্ঞ হতে! আমাকে কোনো দিন বলেনি ছ্যানত্বপের কথা। আমিও ভেবেছিলেম অমন নীচতার কথা তুলে নিজেকে নীচ করব না। ছ্যানত্বপের সঙ্গে আমার শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত ব্যবধান এতই বৃহৎ যে ওর সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা কল্পনাও করতে পারতেম না। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেম যে আমরা ছ'জনেই নারী এবং আমাদের উভয়েরই চরম পরিচয় সেই নারীত্বেই!

"তারপর পরশু যখন ফালুং থেকে এক দূর-সম্পর্কীয়া পিস

এসে হাসতে হাসতে অনেক কথা শুনিয়ে গেল তখন আর পারলেম না চুপ করে থাকতে। ও আমাকে আর ভালোবাসে না, আমিও বাসি নে। আমার মনে ওর জন্মে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। কিন্তু তাই বলে এই অপমান সহ্য করব কেমন করে? জিগেস্ করলেম হ্যানহুপের কথা। সোজা অস্বীকার করল। হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল কথাটা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলেম, এবারে আরো রূঢ় ভাবে। অনেক অপমান করাতে তখন রেগে গিয়ে বলল, হ্যাঁ, ও হ্যানহুপকে ভালোবাসে। অনেক দিন থেকেই। মুখের উপর স্পষ্ট আমায় বলল যে আমাকে আর ওর ভালো লাগে না। আমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হয় না, কাছে আসতে বিরক্ত লাগে। তার পর আমি কিছু বলতে বা করতে পারার আগেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।”

আমরা তখন ক্যালকাটা রোডের মোড়ের প্রায় কাছে এসে গেছি। মিসেস্ রায় আমাকে দূরে ডান দিকে একটা বাড়ি দেখিয়ে বললেন, “আপনার জন্মে ওখানে জায়গা ঠিক করে দিয়েছি। আপনি সোজা ওখানে চলে যান। ওরা জানে যে আপনি যাবেন, কোনো অসুবিধা হবে না।”

আমি মোড় ফেরবার আগে মিসেস্ রায় হঠাৎ ওভার-কোটের ভিতর থেকে একটা কী বের করে বললেন, “এটা কী জানেন? থাক, জেনে কাজ নেই। কিছুক্ষণ আগে জিগেস্ করছিলেন না যে ওই লোকটা আমার জন্মে কী করেছে? এইটে ও-ই দিয়ে গেছে। হ্যানহুপ শেষ হয়েছে, এবার রায়ের

পালা। সেটা কি আর অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পারি। এখন সেখানে যাচ্ছি যেখানে রায় হাতে-পায়ে বাঁধা আছে। এর মতো সমাধান আর নেই! রায় নিরুদ্দেশ হলে অনেক বাজে কথা শুনতে হোতো। এর পরে আর কেউ বলতে পাবে না যে রায় আমাকে ফেলে চলে গেছে!"

মিসেস রায় বাঁ দিকে গেলেন। আমি ডান দিকে।

পরিব্রাজকের হ্যাভারস্যাকে অবশ্যবহনীয় কতগুলি জিনিস আছে—যেমন দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, ফ্লাসক্, বাড়তি মোজা-রুমাল-অন্তর্বাস, ফার্স্ট এইডের বাক্স ইত্যাদি, ইত্যাদি। এগুলি সঙ্গে না থাকলে বিদেশে-বিভুঁয়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ভ্রাম্যমানের মানসিক ঝুলিতে যে দু'টি জিনিস না থাকলে পরিব্রজনই ব্যর্থ হয় তা হচ্ছে কৌতূহল আর বিস্ময়বোধ।

আদর্শ পর্যটক এই দু'টি বৈশিষ্ট্য দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত। সে ঘর ছাড়ে বহির্বিশ্বকে আবিষ্কার করতে, আবিষ্কার করে ঘরে ফিরে সবাইকে সে কাহিনী শোনাতে। তার চোখজোড়া জিহ্বার চর মাত্র, নানা খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহের ভার তাদের উপর। কোথায় কোন জিনিস ভালো, কোন কোন দোকানে কী কিনলে সস্তায় পাওয়া যায়, কোন হোটেলের খাবার সব চেয়ে ভালো আর কোন হোটেলের শয্যা, এমনিতর সহস্র প্রয়োজনীয় তথ্যের সম্ভারে সংগ্রহ তার সমৃদ্ধ। তার পরিচিত পরিবেষ্টনীর বাইরে সে যা কিছু দেখে তার নূতনত্ব তার মনকে আকৃষ্ট করে প্রবল ভাবে, তাই কোনো কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। সে নিজেকে মনে করে পথিকৃৎ বলে। তার সংগৃহীত সংবাদে পরবর্তী পদাংক-অনুসরণকারী সবাই উপকৃত হবে, তার কাহিনীর বিবৃতি শুনে পিছে-পড়ে-থাকা সবাই

চমৎকৃত হবে—এবং ঈর্ষিত হবে—এমনিতর অনেক ভাবনা তার বহিরাগত চোখকে জাগ্রত রাখে প্রতিটি প্রহর।

আমি এই দ্বিবিধ বোধ থেকেই একেবারে মুক্ত। আমার যা কৌতূহল তার প্রত্যক্ষ নিবৃত্তির সন্ধানে আমার রুচি সামান্যই। ছাপার অক্ষরের দৌত্যে, অর্থাৎ অপরের রচনার মধ্যস্থতায়, জ্ঞান-সংগ্রহেই আমার পক্ষপাতিত্ব। তার অনেক সুবিধা। এতে নৈরাশ্যের সম্ভাবনা অনেক কম, কেন না, রচনার কৌশলে সাধারণ অসাধারণের বৈচিত্র্য-সমন্বিত হয়ে ওঠে, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরের সম্বন্ধেও কৌতূহল উদ্দীপিত হয় এবং একান্ত তুচ্ছ বস্তুও পরম উপাদেয়তা লাভ করে।

পরের মুখে ঝাল খাওয়ার সুবিধাই এই যে এতে রস থেকে বঞ্চিত হতে হয় না, অথচ রসনাও লাঞ্ছিত হয় না।

তা ছাড়া নিজের ভ্রমণের চাইতে পরের বিবরণের আরো একটা সুবিধা এই যে, কাহিনীতে অভিজ্ঞতার সেইটুকুই শুধু গ্রহণ করতে হয় যা হৃদয়গ্রাহী। ডি-এচ রেলওয়ের খেলনা-গাড়িতে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙে উঠতে যে দীর্ঘ, প্রায় নিঃসীম, ক্লান্তিকর ঘণ্টাগুলি অতিবাহিত হয়, পাঠকের সে শাস্তি ভোগ করতে হয় না একেবারেই। মধ্য-রাত্রে শয্যা ত্যাগ করে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে টাইগার হিলে আরোহণ করে যে অবর্ণনীয় সূর্যোদয়ের শোভা দেখতে পাওয়া যায়, পাঠককে শুধু সেই আনন্দেরই অংশ গ্রহণ করতে হয়; পরের সাত দিনের সর্দিতে তাঁকে হাঁচতে হয় না, তিন দিনের পায়ের ব্যথাটাও পুরোপুরিই পরিব্রাজকের নিজের। আমি জাতকুঁড়ে, অর্থাৎ সামান্যতম

শারীরিক পরিশ্রমে আমার অপরিসীম বিরাগ। দিনে কুড়ি ঘণ্টা টেবিল-চেয়ারে বসে ভ্রমণ কাহিনী বা যে-কোনো বই পড়তে পারি, বা লিখতে, কিন্তু হাতের কাজে আমি বিশ্বের অক্ষমতম ব্যক্তি। মহাত্মা গান্ধীর বেসিক্ এডুকেশনে আমার অচলা ভক্তি, কিন্তু আপনি আচরি কখনো সে ধর্ম পরকে শেখাতে আদিষ্ট হলে বড়ই বিপন্ন বোধ করব।

পরিব্রজনের আবিষ্কার আবার দু'রকমের। কারো কৌতূহল বস্তুতে, কারো বা ব্যক্তিতে। কেউ কলকাতা এলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল দেখতে যান, কেউ বা সাক্ষাৎ করতে যান প্রদেশপাল বা প্রাদেশিক কন্‌গ্রেসের সভাপতির সঙ্গে। এদিক্ থেকেও আমার কৌতূহল অত্যন্ত পরিমিত। আগ্রায় যে তাজমহল আছে তা আমি ঐতিহাসিকের জবানিতে এবং কবির কবিতায় জেনেই সন্তুষ্ট থাকি, প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি নে। আর ব্যক্তিদর্শনে যে আদৌ স্পৃহা ছিল না তা তো বলাই বাহুল্য—তার জন্যে কি আর কেউ শীতের সময় জনশূন্য দার্জিলিঙে আসে?

আমি যে-আবিষ্কারের জন্যে আলস্য পরিহার করে ঘরের বাইরে বেরুই তা একান্তই আভ্যন্তরীণ। চক্ষু দ্বারা সাধ্য নয় সে-আবিষ্কার, আদৌ সম্ভব কি না তা-ও নিশ্চিত ভাবে জানি নে। আমার একমাত্র কাম্য আবিষ্কার নিজের আবিষ্কার, নিজকে আবিষ্কার। আমার ভ্রমণ তাই দ্রষ্টব্যের সন্ধান নয়, দর্শনের সন্ধান। দার্জিলিং বা যেখানেই আমি যাই না কেন

তা আমার লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। আত্মাবিষ্কারের পরিবেশ মাত্র। সে শুধু পট-ভূমিকা, চিত্র নয়।

দার্জিলিঙের নির্জনতায় এসেছিলেম অনেকগুলি জিজ্ঞাসার বোঝা বহন করে। এসেছিলেম অনেকগুলি সমস্যার সমাধানের আশায়, অনেকগুলি সমাধানের পুনর্বিবেচনার বাসনা নিয়ে। ভেবেছিলেম সম্মুখের অবিভক্ত অবসরের মধ্যে একটু চেষ্টা করব আমার দ্বিধাবিভক্ত, সন্দেহ-বিক্ষত মনের মধ্যে কিঞ্চিদধিক শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্যের বিধান করতে। ঈশ্বর, মানব, দৈব, কর্ম, ভালো, মন্দ, হিংসা, ন্যায়, অন্যায় ইত্যাদি নানা সূক্ষ্মতত্বের বিবেচনা করে অন্তত সাময়িক কয়েকটা আত্মতুষ্টিজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হবো, এই রকম প্রতিজ্ঞা করেছিলেম নিজের কাছে।

এই ধরণের অ্যাবষ্ট্রাক্ট চিন্তায় আমার অধিকার অল্পই। দার্শনিকের শিক্ষা নেই আমার। সাম্প্রতিকতার কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা আমার চিন্তাক্ষেত্রে নিরাকার চিরন্তনতার প্রবেশ-পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। কিন্তু মিনিট তো ঘণ্টার অংশ, সাময়িকতা তো চিরন্তনীর খণ্ড।

অংশকে না জানলে যেমন সমগ্রকে জানবার উপায় নেই, তেমনি সমগ্রকে না জানলেও বোধ হয় সাময়িককে সম্যক্ বোঝা হয় না। বৃক্ষকে বাদ দিয়ে অরণ্য হয় না, কিন্তু দৃষ্টি যদি কেবল মাত্র বৃক্ষেই আবদ্ধ থাকে তাহোলে অরণ্য অজ্ঞাত থেকে যায়। আমার সংসার-যাত্রা বৃক্ষসংকুল, কিন্তু অরণ্যকেও উপেক্ষা করতে পারিনে। এই ঘরের খেয়ে বনের মোষ

তাড়ানোর বিলাসে বন্ধুজনের হাস্যোদ্রেক হলে আপত্তি করব না। কিন্তু ধনিজনের শিকার-বীরত্বের চাইতে আমার এই স্বভাব যে অপেক্ষাকৃত অহিংস তা অস্বীকার করা হবে না আশা করি।

আমার এই চিন্তানুশীলন থেকে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, এমন দুরাশা পোষণ করিনে। এ আমার নিজেরই মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে ব্যায়াম মাত্র। যাঁরা বেতারে-রেকর্ডে শুধু মাত্র আধুনিক গান গেয়ে থাকেন তাঁরাও যেমন কণ্ঠের উন্নতিসাধন মানসে স্বরগ্রাম সাধনা করেন, আমার এই দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-বহির্ভূত চিন্তার অভ্যাসও সেই রকম।

উপরে যে প্রশ্ন বা সমস্যাগুলির উল্লেখ করেছি সে তালিকা সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু সে গুলিকে যোগ করলে যে দু'টো প্রশ্নে এসে দাঁড়ায় তা হচ্ছে ঃ কেন বাঁচব? কেমন করে বাঁচব? চিন্তাশক্তির বয়ঃপ্রাপ্তির পর থেকে বহু বার এই দুই প্রশ্নের বহু উত্তর স্থির করেছি নিজের মনে। কিন্তু হায়, সেই স্থিরতা-গুলি স্থায়ী হতে পারল না আজও। আমার সকল গত কল্যকার সেই অসংখ্য উত্তরগুলি যেন সংখ্যাহীন শূন্যের অন্তহীন মালা—তার বাঁয়ে একটা এক নেই বলে তারা সব শূন্যই রয়ে গেল, সংখ্যা হতে পারল না।

(জীবনকে তখন মনে হয় একটা বোবা দেয়াল বলে, শত মাথা কুটলেও যার কাছ থেকে কোনো উত্তর মেলে না, মেলে শুধু আপন প্রশ্নের বিকৃত প্রতিধ্বনি। বেঁচে থাকার দিনগুলিকে তখন মনে হয় একটা সংখ্যাতীত সিঁড়ির সমষ্টি বলে, দিনের

পর দিন একটি একটি করে তাদের অতিক্রম করা শুধু অতিক্রম করারই জন্যে—কোথাও পৌঁছোবার জন্যে নয় যেন!

দার্জিলিঙের অনবচ্ছিন্ন অবসর আর অনাবিল রৌদ্র আর আলোর মধ্যে আমার সেই অনুচিন্তনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কোথায় হারিয়ে গেছে! এখন সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে যা বলি তার মর্মটা মোটামুটি এই যে সকল রকম চিন্তা যেন শত হস্ত দূরে রাখতে পারি। প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গেল, শূন্য শূন্যই।

এদিকে দেখাও হোলো না কিছু। অবজার্ভেটরি, মহাকাল, লয়েড বটানিকস, ম্যুজিয়ম, ভিক্টোরিয়া ঝর্ণা, মন্দির-মসজিদ-মনাষ্টেরি ইত্যাদি যত কিছু টুরিষ্টের হৃদয় জয় করবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তার সব-কিছু রয়ে গেল দেখার বাইরে। ওগুলি দেখতে যাওয়ার মতো উৎসাহই অবশিষ্ট নেই। মনের ক্লান্তি সংক্রামিত হয়েছে দেহে।

না পেলেম প্রশ্নের উত্তর, না হোলো দৃশ্য দেখা। না পেলেম চিত্তের প্রশান্তি, পর্যটকের উত্তেজনাও রইল অজানা।

অভিজ্ঞ ব্যক্তির বুঝতে কষ্ট হবে না কেন এর পরে প্লিভার অভিমুখে যাত্রা করলেম।

দার্জিলিঙের অনাবাসিক খাবার-জায়গাগুলির মধ্যে প্লিভারই খ্যাতি সর্বাপেক্ষা অধিক। শুনেছি, দোকানটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কোন সুইস ব্যবসায়ী। বর্তমানে ভারতীয় তত্বাবধানে খাদ্যের অবনতি ঘটেছে বলে যে অভিযোগ শুনেছিলেম তা পরীক্ষা করে না দেখলেও সত্য বলে মনে করি

না। অন্তত অন্যান্য সার্ভিসে যে অবনতি ঘটেনি তার প্রমাণ পেয়েছি। কলকাতায় তুর্লভ এমন বহু জিনিস ওখানে মেলে।

বাকী দার্জিলিঙের মতো এই রেষ্টুরেণ্টটাও এখন প্রায় জনহীন। শূন্য টেবিলগুলি করুণ ভাবে শূন্য চেয়ারগুলির দিকে তাকিয়ে আছে। নীরব বাদ্যযন্ত্রগুলি—একটা পিয়ানো, গোটা-তুই ড্রাম আর একটা ডাবল্ বেস্ বা চেলো—অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে সামনের উঁচু জায়গাটায়। এক দিন তাদের বাজনায় অনেক আনন্দসন্ধানীর পদযুগল চঞ্চল হয়েছে। আজ কেউ নেই সে-বাজনা শুনতে। তাই বাজাতেও কেউ নেই। কাউণ্টারের এক কোণে তুটো বেয়ারা শীতে কাঁপছে চোখ মুদে। অধীর ভাবে অপেক্ষা করছে কখন বন্ধ করবার সময় হবে। বাইরের অন্ধকার রাত আপন ধ্যানে স্থির, তাড়া নেই কোনো কিছুরই জন্যে, বেয়ারাদের অধৈর্য্য সত্বেও। কাল নিরবধি।

আমার যা দরকার ছিল তা নিয়ে আমি জানালার ধারে একটা টেবিলে এসে বসলেম। জানালাটা বন্ধ, কিন্তু কাঁচের। দেখবার বাধা ছিল না।

লোকগুলি ক্ষুদ্রকায়, বাড়িগুলি ছোটো, রেলগাড়িগুলি শিশুদের খেলার উপযুক্ত, এই সব মিলিয়ে দার্জিলিং জায়গাটা এমনিতেই অদ্ভুত। ওখানে উঁচু, এত উঁচু যে আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। এখানে নীচু, এত নীচু যে তার অতল গহ্বরে পড়লে আর কখনো খোঁজ পাওয়া যাবে না। ওখানে একটা অতি আধুনিক ধরণের বাড়ি, আগামী কালের ডিজাইনে

তৈরী। এখানে একটা কুঁড়ে ঘর, সেটা যেন মানুষেরই তৈরী নয়, তার যেন সৃষ্টি হয়েছিল ধরা-বক্ষে মানবের আবির্ভাবেরও আগে, বুঝি বা ইতিহাসের আরম্ভের পূর্বে।

দার্জিলিং দর্শনে কল্পনাবিলাসী আগন্তুকের মনে প্রথম যে ধারণা মনে আসে তা এই যে জায়গাটা যেন বিশ্বকর্মার সৃষ্টি নয়, বিশ্ববিধাতা যেন খেলার ছলে তৈরী করেছেন বাঙলা দেশের উত্তর কোণের এই খেলা-ঘরটা। গোয়েঙ্কার রোপ-ওয়ের লাইনটা ওই যে দূরে আকাশের গায়ে বেত্রাঘাতের দাগের মত দীর্ঘায়ত হয়ে শুয়ে আছে, ওটা যেন বৃহৎ একটা অসঙ্গতি। খেলার মধ্যে বাণিজ্যের অপ্রীতিকর স্মারক, যেন ছবির খাতায় প্রোডাকৃশন কার্ড।

রাতের বেলায় শহরটার এই খেলা-ঘরের রূপটা যেন আরো বেশি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দূরে সারি সারি কয়েক ঘরে টিম-টিম করে আলো জ্বলছে, চতুর্দিকের কালো একটা বিরাট জন্তুর হাঁ-র মতো ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে সেই ক্ষীণ আলোর ঔদ্ধত্য হাস্যকর। ছোট বাড়িগুলিকে আরো ছোট বলে মনে হচ্ছে, তাদের ভিতরের আলোর মালা যেন কোন শিশুর কোমল হাতে সাজানো পঞ্জিকাস্বাধীন দীপালি। দূর থেকে দেখা এই আলো আর অন্ধকারে অদৃশ্য বৃহতী প্রকৃতি, সব কিছু জড়িয়ে আমার চার দিকের বিশ্বকে মনে হচ্ছিল কোন বিরাট শিশুর নিঃশব্দ অট্টহাস্যের মতো!

বাইরে থেকে চোখ ফেরাতে হোলো সশব্দ এক অট্টহাস্য শুনে। এই প্রথম বুঝতে পারলেম যে আমি একা নই। হাসির

শব্দ অনুসরণ করে প্লিভার দোতলার খাবার ঘরের দূরতম স্বল্পালোকিত কোণে যাকে দেখলেম তাকে চেনবার উপায় ছিল না। সারা গায়ে গরম জামা, মাথায় এবং গলায় মোটা মাফ-লার, হাতে দস্তানা ; শুধু রক্তবর্ণ চোখ দু'টো জ্বল-জ্বল করছে।

আমার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময়ের তিনি যে অর্থ করলেন তা বুঝতে বিলম্ব হোলো না। ভদ্রলোক উঠে এসে আমার টেবিলে বসলেন। অনুমতি প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল না। স্থানবিশেষে কালবিশেষে সকল লৌকিকতা বিসর্জন দেওয়া হয় উভয় পক্ষের অনুক্ত সম্মতিতে। আলাপের সুরু ইংরেজিতে।

"What will you have ?

"The same poison if I may" আমি মামুলি উত্তর দিলেম।

ভদ্রলোক বেয়ারাকে তদনুযায়ী আদেশ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী অত ভাবছিলেন বাইরের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থেকে ?"

যা ভাবছিলেম তা কাউকে বলবার মতো নয়। বললেম, "বিশেষ কিছু নয়। এমনি বসেছিলেম। আপনি কতক্ষণ থেকে আছেন ?"

"আপনারও অনেক আগে থেকে। আপনাকে লক্ষ্য করছিলেম অনেকক্ষণ থেকেই। একা-একা ভালো লাগছিল না বলে এখানে এলেম।"

"আমারও একা ভালো লাগছিল না।" কথাটা কেবল মাত্র ভদ্রতার জন্যেই বলিনি।

"তাহোলে এবার বলুন অবিশেষ কী ভাবছিলেন।"

"এই—অতীত—বর্তমান—ভবিষ্যৎ," আমি এমনি একটি সর্বকালীন উত্তর দিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নের পথ রোধ করবার চেষ্টা করলেম।

ভদ্রলোক কথা বলবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিলেন। আমার অনির্দিষ্ট উত্তরও তার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি আমার দিকে না তাকিয়ে, প্রায় আপন মনে বলে চললেন, "ভাবতে গেলেই মুস্কিল। ভাবিয়া কোরো না কাজ করিয়া ভাবিও না—এই হচ্ছে ঠিক কথা।" আপন মনে হাসলেন ভদ্রলোক।

ভাবতে বারণ করে নিজেই বোধ হয় একটু ভেবে যোগ করলেন, "অবিশ্যি সব চেয়ে ভালো কাজ না করা। যেমন আমি করি নে।" আবার হাসলেন।

তাঁর বাক্যের জড়তার মতো চিন্তার জড়তাকেও স্মিতহাস্যে ক্ষমা করলেম। আমার হাসি তাঁর দৃষ্টি এড়ালো না। কিন্তু তিনি ক্ষুণ্ণ হননি। বরং আমারই অজ্ঞতাকে যেন তিনি ক্ষমা করছেন, এমনি ভাবে হাসলেন। বোধ হয় আমার মতো সকল পণ্ডিত-মূর্খের উদ্দেশে আবৃত্তি করলেন:

"And if the Wine you drink, the Lip you press
End in the Nothing all Things end in—Yes—
Then Fancy while Thou art, thou art but what
Thou shalt be—Nothing—Thou shalt not be less,
এবং বেশিও নয়, এক কাণাকড়িও নয়। শত পরিশ্রম করলেও নয়।"

শ্লোকটির গঠন একটু ঘোরালো। তবু পূর্ব-পরিচিতি এবং ভদ্রলোকের আবৃত্তির শুদ্ধ বিরতির জন্যে অর্থোদ্ধারে কষ্ট হয়নি। কিন্তু কাব্যের অধরা উদ্‌ধৃতির সঙ্গে তো যুক্তি দিয়ে যুদ্ধ করা চলে না। বললেম, "হুঁ, মুস্কিল এই যে জীবনটা কাব্য নয়। কঠোর সত্য।"

"কঠোর, কিন্তু সত্য নয়। কাব্যই সত্য।"

"ডিপেণ্ডস্, সত্যের কোন সংজ্ঞা আপনার মনঃপূত।"

"কোনোটাই নয়। এর মধ্যেই নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে মেটাফিজিক্স্ আমার লাইন নয়। তাছাড়া বিশ্বাসে কৃষ্ণ মেলে বলে যদিও বিশ্বাস করি নে, তর্কে যে মেলে না তা জানি।" একটু থেমে বললেন, "আচ্ছা, জীবন যদি কাব্য না-ও হয়, তাকে কাব্যের মতো সুষম, সুন্দর করলে দোষ কী?"

দোষ কিছু নেই হয়তো, কিন্তু সম্ভব কি না সেইটেই প্রশ্ন।"

"আমার উত্তর হচ্ছে এই যে চেষ্টাই করা হয়নি। যারা চেষ্টা করেছে তাদের উৎসাহ দেওয়া তো দূরের কথা, কেবলই বাধা দেওয়া হয়েছে।"

আমি নিজে প্রায়শই বিশ্বের, সমাজের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ করে থাকি। তখন সেগুলি অত্যন্তই সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু অপরের মুখে অপরের অভিযোগ শুনে মৃদু বিরক্তি হোলো, ভালো লাগল না। আপন অক্ষমতা, আপন ব্যর্থতার জন্যে আর সবাইকে দোষী করাকে মনে হোলো কাপুরুষতা বলে। ভদ্রলোককে সে কথা স্মরণ করিয়ে না দিয়ে বললেম,

"তাই তো বলছিলেম, এই বাধা অস্বীকার করা যায় না বলেই জীবন কঠোর সত্য।"

"হয়তো আপনি ঠিক বলেছেন, হয়তো নয়। তর্ক করব না। জীবন কঠোর সত্য বলেই হয়তো কোমল সত্য অরণ্যকে বরণ করে নিয়েছিলেম। ভুল করিনি, এ কথা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি। অনেক দিন আগেই আমি

Divorced old barren Reason from my Bed,

And took the Daughter of the Vine to Spouse"

আমি বললেম, "আধুনিক পরিভাষায় তাকে পলায়ন বলে কিন্তু। নতুন সমাজ যে এই সব পলাতকদের ক্ষমা করবে না সেই হুঁসিয়ারি আপনার এখানে এসে পৌঁছোয়নি বোধ হয়।"

পৌঁছেছে, কিন্তু আর যারই অভিযোগ থাক আমাদের বিরুদ্ধে, সমাজের কিছু বলা উচিত নয়। সমাজের ক্ষতি আমরা করিনি। সমাজের ক্ষতি করেছে আপনার নিষ্কলংক, চরিত্রবান, ধর্মপরায়ণ সমাজহিতৈষীরা। যারা সমাজের ভালো করবার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে বলে উচ্চৈস্বরে গগন বিদীর্ণ করে সহস্র সহস্র অপরের দেহ বিদীর্ণ করে প্রাণ নিয়েছে নির্মম ভাবে, ভালো করবার অজুহাতে। আপনার মুসলিনী আবিসিনিয়াকে সভ্য করবে বলে যুদ্ধ বাধিয়েছে, আপনার হিটলার জার্মাণ সংস্কৃতি সারা বিশ্বে বিকিরণ করে মানব জাতির উন্নতি বিধান করবে বলে লড়াই করেছে, আপনার স্টালিন শোষণের নিষ্পেষণের উচ্ছেদের নামে অগণ্য নিরপরাধের রক্তধারায় অবগাহন করেছে। আমরা, পলাতকেরা, নিজেদের নিয়ে যাই

করে থাকি অপরের বা সমাজের কোনো ক্ষতি করিনি। তার সকল দায়িত্ব আপনার হিতৈষীদের দরজায় রাখতে হবে। তাদের দরজায় যারা জগতের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে—অর্থাৎ মঙ্গল সম্বন্ধে তার নিজের যা ধারণা তা আর সকলের উপর চাপাবার উদ্দেশ্যে—বিরোধ বাধিয়েছে। আমরা অন্তত এই ধারায় নট্ গিলটি।” ভদ্রলোক বক্তৃতার শেষ লাইনে এসে একটু হাসলেন, কিন্তু উত্তেজনার আভাস ছিল সেই হাসিতেও।

প্রতিবাদ করলেম না। বক্তৃতা শেষে পূর্বের সৌজন্যের প্রতিদানের জন্যে বেয়ারাকে নিঃশব্দে আদেশ দিলেম হস্ত-সঞ্চালন করে।

সামাজিক মানুষের সকল আলোচনায় যে অবশ্যম্ভাবী সাম্প্রতিকতা আছে, তা পরিহার করবার জন্যেই আমিও সাময়িক ভাবে পলায়ন করে দার্জিলিঙে এসেছিলেম। এই তর্কে যোগ দিতে তাই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু, সত্যি, উত্তর কী এই প্রশ্নের? মনুষ্য-সমাজে এত যে মন্দের জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়ে আছে তার থেকে মুক্তি হবে কী উপায়ে? বক্তৃতা আর প্রচার করে যদি অর্থলোভী ব্যবসায়ী আর শক্তিগৃধ্নু রাজনীতিকের বিবেকের পরিবর্তন সাধন করতে হয়, তবে কত যুগ লাগবে সেই চিকিৎসায়? আর দ্রুত আরোগ্যের লোভে যদি ছুরি ওঠে সার্জেনের হাতে, তাহোলে সে ছুরি শেষে কার বুকে বসবে কে জানে?

বেয়ারা আদেশ পালন করলে ভদ্রলোকের দিকে সময়োচিত ইঙ্গিত করে বললেম, “সমাজের কথা ভাবছিলেম

না ঠিক। যে লোক নিজেরই জীবনে সামঞ্জস্য আনতে পারলে না তার অপরকে ভালো করবার মতো ঔদ্ধত্য নেই। আমি ভাবছিলেম নিজের কথা।"

আমার অনাহূত সঙ্গীও তাই ভাবছিলেন, তাঁর নিজের কথা। সহসা আত্মসচেতন হয়ে বললেন, "আমারও সে ঔদ্ধত্য নেই। আমি চাই না হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক। এমন কি, পরজন্মে ব্রজের রাখাল বালক হবারও বাসনা নেই। গতজন্ম ছিল না এবং ঈশপের গল্পের বোকা কুকুরের মতো পরজন্মের ছায়ার লোভে ইহজন্মের মাংসের টুকরোটা হারাতে মোটেই রাজি নই।" আবার আবৃত্তি করলেন,

"A Muezzin from the Tower of Darkness cries
Fools! your Reward is neither Here not There"

ভদ্রলোক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এবং শুধু ক্লান্ত নয়। কিন্তু তাঁর কথা ফুরোয়নি, হয়তো আরম্ভই হয়নি এখনো। আবার মাথা তুলে বললেন, "আমার কী মনে হয় জানেন? মানুষের কর্মক্ষমতা ছাড়িয়ে গেছে তার শুভবুদ্ধিকে। তার উদ্ভাবনী শক্তি উন্মত্ত বেগে এগিয়ে যাচ্ছে তার মঙ্গলবুদ্ধিকে পিছনে ফেলে রেখে। মানুষ তাই দুরন্ত শিশুর মতো নিজের ধ্বংস-ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে যা-কিছু সামনে পাচ্ছে তাকেই ভাঙছে।" উদ্দাম, অদ্ভুত হাস্যে যোগ করলেন, "ভাঙছে যে নিজেরই বর্তমানকে এবং নিজেরই ভবিষ্যৎকে তা যখন বুঝতে পারবে তখন হয়তো বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নামক দু'টো

খেলনারই অবস্থা মেরামতের বাইরে চলে গেছে।" আবার বিপুল, বিকট হাসি। "অবস্থাটা উপভোগ্য বটে!"

উপভোগ্য? না কি অশ্রু-বিসর্জনের যোগ্য? ভদ্রলোকের হাসির অর্থ বুঝতে পারলেম না। শুধু বললেম, "আপনার বিভীষিকাময়ী ভবিষ্যদ্‌বাণীর সঙ্গে হাসির উচ্ছ্বাসের যোগ খুঁজে পাচ্ছি নে তো?

"যোগ আছে", ভদ্রলোক এক মুহূর্তও না ভেবে উত্তর দিলেন, "যোগ আছে। কেন না, যে পৃথিবীর ধ্বংসসাধন হচ্ছে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। ঈশ্বরকে, অর্থাৎ আমাকে ধন্যবাদ: আমি সময় থাকতে সরে এসেছি।"

"ভাজার মাছ যেমন তপ্ত কড়া থেকে জ্বলন্ত উনানে সরে আসে।"

"মোটেই নয়। নোয়া যেমন করে বন্যা থেকে তার নৌকায় সরে এসেছিল। আমি তেমনি সরে এসেছি। এখন আমি দর্শক—গ্রাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড থেকে দেখব আর হাসব।"

"এতে আর যাই থাক বীরত্ব নেই। বিচক্ষণতাও আছে কি না সন্দেহ করি।"

"বীরত্বে লোভ নেই। বিচক্ষণতা ঘৃণা করি। আপনারা বোকা ক্যাসাবিয়াংকার মতো বার্ণিং ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ুন! আপনাদের জন্যে করুণাও হয় না।" কণ্ঠে তীব্র তিক্ততা।

"যারা দাঁড়িয়ে পুড়ছে তাদের আপনার করুণায় প্রয়োজন নেই। তারা জানে কেন মরছে। তাদের কাজে আর যাই

থাক বা না থাক, তাদের উদ্দেশ্যের মহত্ব অস্বীকার করবেন না
আশা করি।"

"দোহাই আপনার, মূর্খতাকে মহত্বের আখ্যা দেবেন না।
দু'টো একেবারেই আলাদা জিনিষ। বরং বলি একটা বস্তু,
আরেকটা মিথ্যা—একেবারে মীথ! দু'টোরই পরিণাম
অবিশ্যি এক।

Why, all the Saints and Sages who discuss'd
Of the two Worlds so learnedly, are thrust
Like foolish prophetsforth, their Words to Scorn
Are Scattered, and their mouths are Stopt
with Dust.

ডাষ্ট! ধূলো! সেখানেই স্থরু এবং সেখানেই শেষ!
এই দু'য়ের মাঝের সময়টায় আপনারা পরিশ্রমারা ঘাম ফেলে
তাই দিয়ে ধূলোকে কাদা তৈরি করুন। সেই কাদা দিয়ে
মূর্তি গড়ে আত্মসান্ত্বনা লাভ করুন। We know better,
আমরা জীবন নামক উইণ্ডমিলের সঙ্গে ডন্ কুইোটির মতো
লড়াইয়ের আস্ফালন করি নে। পরিহাসকে আমরা পরিহাস
বলে জানি। তাই আমি হাসছি আর আপনি লম্বা মুখ নিয়ে
বসে আছেন।"

উচ্চ হাস্যে চীৎকার করলেন, "বেয়ারা—"

"মুখ যতই লম্বা করুন, জীবনটা দীর্ঘ নয়। সময় নেই
সময় নষ্ট করবার! আসুন।"

"কিন্তু সময় অল্প বলেই তো তার অপব্যয় আরো বেশি
অন্যায়।"

"ডিপেণ্ডস্, আপনি কাকে অপব্যয় বলেন।"

"কিছু না করা নিশ্চয়ই অপব্যয়।"

"টাকার বেলায় তাকেই তো সঞ্চয় বলে!" ভদ্রলোকের সূক্ষ্ম রসবোধ তখনো অক্ষুণ্ণ আছে, হেসে বললেন, "কিন্তু রসিকতা থাক। কোনো কিছু করা—তা সে যতই ভুল হোক, যতই অন্যায় হোক, যতই ক্ষতিকর হোক—তাকে যদি সময়ের সদ্ব্যবহার বলেন তাহোলে অবিশ্যি বলবার কিছু নেই।"

"না, তা বলছি নে। কিন্তু ভালো কাজ বলেও তো সংসারে কিছু আছে।"

"আছে না কি? জানি নে তো। কার ভালো?" মৃদু বিদ্রূপের আভাস।

"নিজের এবং অপরের। সকলের ভালো।"

"নিজের ভালো মানে তো laissez faire অর্থাৎ পাঁচ বছরের শিশুকে সূতোর কলে খাটানো আর তিন দিনের শিশুকে কোলে নিয়ে তার মাকে কয়লার খনির তলায় পাঠানো। এই তো নিজের ভালো!"

"কিন্তু—"

"দাঁড়ান। আর পরের ভালো মানে তো হিটলার আর ষ্টালিন। অর্থাৎ যুদ্ধ আর বিপ্লব। অর্থাৎ রক্ত আর রক্ত?"

"কিন্তু এ দু'য়ের মাঝখানে কি কিছু নেই?"

"কিচ্ছু না। নট এ থিং। অন্তত..."

এবারে আমি বাধা দিলেম, কিন্তু আপনার ডায়াগনোসিস্ যদি বা ঠিক, চিকীৎসা কী? সে সম্বন্ধে তো কিছু বলছেন না।"

"চিকিৎসা নেই। থাকলেও আমাদের তা জানা নেই।"

"কিন্তু নেই আর! শান্তিপূর্ণ উপায়ে একক চেষ্টা দ্বারা ভালো করতে যান, কোনো লাভ হবে না। কেউ শুনবে না। এই মুহূর্তে দিল্লীতে এক পাগল এই মোহের ভুলে কেঁদে মরছে আপন দুঃখে। কেউ কানে তুলছে না তার কথা।"

এর উত্তর ছিল না। ঊনাশি বছরের বৃদ্ধ মহাত্মা সেদিন দু'টো বৃহৎ সম্প্রদায়ের হিংস্র উন্মত্ততা শান্ত করবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে অনশন করেছিলেন। বহু সহস্র সম্পূর্ণ নির্দোষ লোকের মনে তাইতে শোকের ছায়া পড়েছিল। কিন্তু দুর্বৃত্তদের চিত্তের পরিবর্তন হোলো কই? অন্যায় চলেছে অপ্রতিহত। এদিকে স্তব্ধ হতে চলেছে মহত্তম জীবনের জীর্ণ আধারের ক্ষীণ স্পন্দন!

শ্রান্ত কণ্ঠকে একটু বিশ্রাম দিয়ে ভদ্রলোক পুনরায় বললেন, "আর জোর করে দল বেঁধে ভালো করতে যান, দেখবেন, দলের নেতৃত্ব গিয়ে পড়েছে তাদেরই হাতে যাদের ইচ্ছা আপনার সাধু উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। দলের পাণ্ডা হয়ে দাঁড়াবে গুণ্ডারা। বহু হিংসা বহু হত্যার পরে আপনার দল যদি বা কখনো জয়লাভ করে, তখন দেখবেন সেই জয়ের প্রথম ক্যাস্যুয়েল্টি আপনার আইডিয়্যাল। তাতে এক অন্যায়কে সরিয়ে অপর অন্যায়কে সে-জায়গায় বসানো হবে। আর কিছু লাভ হবে না!"

"কিন্তু—"

"আবার কিন্তু! কিন্তু নেই। এ দু'য়ের মাঝে আর কিছু নেই।"

"কিন্তু এ দু'য়ের শেষে?"

"শেষেও কিছু নেই। জীবনটাই হচ্ছে 'one damned thing after another until, at last, there's a final damned thing, after which there isn't anything.' অর্থাৎ বাঙ্‌লা কবির ভাষায়, নিমেষে 'নিমেষ হয়ে যাক শেষ বহি নিমেষের কাহিনী'। এই-ই সত্যি কথা। বেয়ারা—"

এ তো অসীম নৈরাশ্য। এ তো শুধু সমস্যার ব্যাখ্যান। সমাধান কোথায়? এ তো শুধু প্রশ্ন। উত্তর কোথায়? হতাশ অনুত্তরতার অতৃপ্তি নিয়ে আমি চুপ করে রইলেম।

আমার সঙ্গী আমার অস্বস্তি লক্ষ্য করে আপন মনে হাসছিলেন। বললেন, "আমি যা বললেম তা আপনার মনঃপূত হোলো না নিশ্চয়ই। আপনার বোধ হয় ধারণা একটা কিছু করা চাই-ই চাই। তা সে যতই ভুল হোক।" একেবারে কাছে এসে বললেন, "আমি জানি, শুনুন আমার কথা। কিছু করবার নেই। একেবারে কিছু নয়। মাস্টারলি ইনয়্যাক্টিভিটি—ব্যস্।" আমার কানের আরো কাছে এসে ভীত, কর্কশ কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, "কিছু করবার নেই। কিছু করবার নেই। ধ্বংস এগিয়ে আসছে ভীষণ বেগে। তার আগে যে কটা মুহূর্ত আছে, মেক্ দি মোস্ট অব দেম্। এই একমাত্র সত্য কথা:

"…that life flies ;
One thing is certain, and the Rest is Lies."

আর কিছু বলার শক্তি ছিল না ভদ্রলোকের। জড় প্রস্তর-খণ্ডের মতো তাঁর মাথাটা টেবিলের উপর পড়ল একটা বিশ্রী শব্দ করে।

আমি তাঁকে জাগালেম না। 'ও যে বিরাম মাগে নির্মম ভাগ্যের পায়ে। ও যে সব চাওয়া দিতে চাহে অতলে জলাঞ্জলি। দুরাশার দুঃসহ ভার দিক নামায়ে ; যাক্ ভুলে, যাক্ ভুলে অকিঞ্চন জীবনের বঞ্চনা।'

এ নয়, এ নয়। নেতি, নেতি। অনিশ্চিত পদক্ষেপে প্লিভার কাঠের সিঁড়ি দিয়ে যখন নীচে নেমে এলেম তখন রাস্তার দূরের স্তিমিত আলোর ভীরু শিখা হৃদয়ে ভরসার সঞ্চার করল না। কিন্তু নিজের মনে জপতে থাকলেম, এ নয়, এ নয়। নেতি নেতি!

যখন বাড়ির কাছে এসে পৌঁছোলেম তখন ভদ্রলোকের চেহারাটা পর্যন্ত মনে আনতে পারলেম না। কার সঙ্গে এতক্ষণ বসে এত কথা বলছিলেম? এত কথা শুনছিলেম?

সত্যি কি কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল? না কি আমারই একটা বিচ্ছিন্ন, অর্ধপরিচিত, অবজ্ঞাত একটা অংশকে বসিয়েছিলেম আমার টেবিলের উল্টো দিকে? আমার জীবনের উল্টো দিকে?

কিছুতেই ঠিক স্মরণ করতে পারছিনে।

দার্জিলিং জায়গাটাই কিছুটা অলৌকিক। এখানে কোথায় যে ধরণীর শেষ আর কোথায় আকাশের সুরু, বাস্তবের আরম্ভ আর কল্পনার শেষ, তা বোঝা দায়। এখানে সত্য আর মিথ্যার মাঝখানে সীমা-রেখা যদি বা থেকে থাকে তা দৃষ্টির অতীত।

না কি, ওই লোকটা যা বলেছিল, এ দু'য়ের মাঝখানে কিছু নেই—অন্তহীন, অর্থহীন, শূন্যতা ছাড়া?

দশ

দার্জিলিং আজ সার্থকনামা হয়েছে। লিং অর্থাৎ স্থান ব্যেপে দুর্জয় দোর্জে অর্থাৎ ইন্দ্রের বজ্র তার প্রতাপ ঘোষণা করছে ; উচ্চৈঃস্বরে নয়, একঘেয়ে টিপ-টিপ শব্দে। বৃষ্টি ঝরছে সকাল থেকে অবিশ্রাম। এ-বৃষ্টি সমতল ভূমির বৃষ্টির মতো সজোর এবং স্বল্পস্থায়ী নয়। এর ব্যাপ্তি বিস্তৃত, বেগ দুর্বল এবং আয়ু দীর্ঘ। এ বীরের ক্রোধের মতো নয়, এ যেন অভিমানিনী অবলার ক্ষুব্ধ ক্রন্দন। এ যেন তুষের আগুন যা জ্বলে ওঠে না, শুধু জ্বলতে থাকে। এ ঝড় নয়, শুধু ঝরা।

আপাতশ্রুতিতে এই বর্ষণ নিরাপদ বলে মনে হলেও এর মধ্যে গভীর বিপদের আশংকা নিহিত আছে। প্রাচীন ইতিহাস নয়, বর্তমান দার্জিলিঙে এমন বহু শত পুরাতন অধিবাসী আছে যাদের কৈশোরের স্মৃতিতে আজো অক্ষুণ্ণ আছে বছর পঞ্চাশ আগেকার মহতী এক বিনষ্টির সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। আমরা সহরবাসীরা ইলেকশনের ল্যাণ্ডশ্লাইডের কথাই জানি, উপ্‌মাটির উৎস সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই আমাদের মনে।

১৮৯৯ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। তেইশ এবং চব্বিশ তারিখ সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছিল মুষলধারে। সাধ্য ছিল না কারো বাড়ি থেকে এক পা বেরুবার। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি হয়ে গেল প্রায় সাড়ে উনিশ ইঞ্চি। এমন বৃষ্টি

এখানে হয়নি তার আগে বা পরে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। কিন্তু সে শুধু বৃষ্টিই। তার বেশি নয়।

পরদিন সকালে, অর্থাৎ পঁচিশে সেপ্টেম্বর প্রায় আটটার সময় স্থুরু হোলো অভাবনীয় ঝড় আর বাতাস। সে বাতাসে পাহাড়ের গায়ে কাঁপন লাগে, সে ঝড়ে পৃথিবীর ভিৎ পর্যন্ত নড়ে ওঠে। মানুষের ঘর-বাড়ি তার সামনে খড়কুটো, প্রাণের মূল্যও তার কাছে খুব বেশি নয়। সেই দুরন্ত ঝড়ের তলায় অসহায় দার্জিলিং সহরে সেদিন গৃহে গৃহে শুধু এই বাণী উচ্চারিত হয়েছিল : ওম্ মণি পদ্মে হুং, ওম্ মণি পদ্মে হুং, পদ্মমধ্যে অধিষ্ঠিত হে ঈশ্বর, রক্ষা করো, রক্ষা করো।

বধির বিধাতার পুঞ্জিত অভিশাপ এদিকে বর্ষিত হতে থাকল আকাশ থেকে। রংগিত নদীতে বান ডাকল বুঝি সেই একই নির্দেশে। জল উঠল ৩০ থেকে ৫০ ফিট। অন্তত সাতষট্টি জনের মৃত্যু হোলো মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার সংক্ষিপ্ত পরিসরে। তাদের দেহ নিয়ে বিব্রত হতে হয়নি কাউকে। নিধনকর্ত্রী নদীই তাদের বিধানের ভার নিয়েছিলেন।

এদিকে তিস্তা নামল উত্তাল উদ্দামতায়। কোনো বাধা না মেনে পথে যা পড়ল তার সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে সে চলল আপন বেগে। যা ছিল তিস্তা ভ্যালি তা অচিরে পরিণত হোলো নদীবক্ষে। হাজার হাজার বিঘা চায়ের বাগান অদৃশ্য হোলো জলের অতলে। মত্ত বন্যায় বৃহৎ অরণ্য হোলো অবলুপ্ত। মাটি ভেদ করে যে উদ্ভিদ নির্ভয়ে মাথা তুলেছিল আকাশের পানে, আবার তা আর্ত শিশুর মতো মুখ লুকালো

ধরণীর কোলে। পৃথিবীর বুকে প্রাণের আবির্ভাবের পূর্বের সর্বগ্রাসী জলমগ্নতা বুঝি হৃত রাজ্য পুনরায়ত্ত করতে উদ্যত হোলো। ডাঙায় যে জীব-জগৎ বাসা বেঁধেছিল কিয়ৎকালের শুষ্কতার সুযোগে, তারও বুঝি অবসান এলো ঘনিয়ে।

পর্বতের পাষাণে-পাষাণে যে বন্ধন সে মৃত্তিকারই মধ্যস্থতার উপর নির্ভরশীল। দুর্বার জলস্রোতে সেই বন্ধন বিপন্ন হোলো। পর্বতপ্রমাণ প্রস্তরখণ্ডগুলির মৃত্তিকার ভিত্তি শিথিল হতেই তারা খসে পড়তে থাকল এদিক্ ওদিক্। তারই সঙ্গে ধ্বসে পড়ল অসংখ্য ঘরবাড়ি, নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বহু গৃহ, বহু গৃহবাসী। ওরা বলে পুরো দার্জিলিং জেলায় প্রাণহানি হয়েছিল ২১৯ জনের, দার্জিলিং সহরে ৭২ জনের।

"তবে এই সংখ্যাগুলো যে একেবারেই অনির্ভরযোগ্য তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই। অনেক দিন আগের কথা। কিন্তু আজো আমার মন থেকে সেই ভয়াবহ দৃশ্যের সুস্পষ্ট স্মৃতির এক কণাও মুছে যায়নি।

"আমি আমার বাবার হাত ধরে এই মহাকালেই এমনি এক সকালে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখেছিলেম। সহরের উপর এই জায়গাটায়ই ল্যাণ্ডশ্লাইড হয়েছিল সব চাইতে বেশি। আমার চোখের সামনেই একের 'পর এক বিরাট পাথরগুলি এই মহাকালেরই গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রবল শব্দে এবং প্রবলতর বেগে কোন এক অদৃশ্য দানবের অমোঘ আদেশের আনুগত্যে প্রলয়ের খেলায় মেতে উঠেছিল। সেই অদম্য

দানবের মহাক্ষুধার শান্তি হয়েছিল মাত্র শ' তিনেক প্রাণ নিয়ে এ কথা বিশ্বাস করতে পারে না কোনো প্রত্যক্ষদর্শী।"

ম্যালে বেড়াতে এসে হঠাৎ কি মনে হতে হাঁটতে হাঁটতে নিকটবর্তী মহাকালে উঠেছিলেম। উপরে পৌঁছোতেই যখন বৃষ্টি নামল তখন আপন নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিয়েছি বার বার এবং নিরুপায় হয়ে যখন একটা আচ্ছাদনের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলেম তখনও জানতেম না যে আমার যাত্রারোধকারী বৃষ্টির তদপেক্ষা ক্ষতিকর ক্ষমতাও আছে।

যে বৃদ্ধ নেপালী ভদ্রলোক আমাকে তাঁর শৈশবের স্মৃতি থেকে নির্দয়া প্রকৃতির ধ্বংসলীলার কাহিনী শোনালেন তাঁর বর্ণনায় অলংকারের অতিরঞ্জন ছিল না। তাঁর মুখও সাধারণ নেপালীর মতো—ভাবের অভিব্যক্তি তাতে নেই বললেই চলে। ভদ্রলোকের অন্তরনুভূত আবেগের বহিঃপ্রকাশ ছিল সামান্যই কিন্তু কথকের স্বচ্ছ আন্তরিকতা সহজেই শ্রোতাকে আকর্ষণ করে। তাঁর নিরাবেগ বর্ণনায় যে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সুর ছিল তা হৃদয়কে স্পর্শ করে শ্রোতাদের অজ্ঞাতসারে।

বর্ণিত প্রলয়ের মতো বিধিপ্রেরিত সার্বজনীন সর্বনাশের বিরুদ্ধে ভদ্রলোকের মনের কোথাও যেন সামান্যতম অভিযোগও সঞ্চিত ছিল না। ছিল না লেশমাত্র তিক্ততা। এই দুর্দৈব যেন ছিল দৈবের অপার করুণাময়তারই অপর একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ! এজন্যে যেন, অভিযোগ তো দূরের কথা, ধন্যবাদই দিতে হবে ঈশ্বরকে! এ যেন ক্ষতি নয়, ক্ষত নয়, শাস্তি নয়, শুধু অনুগ্রহ!

প্রত্যক্ষ ধ্বংসস্তূপের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সেই ধ্বংসের অপ্রত্যক্ষ কর্তাকে সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানানোর বিরুদ্ধে আধুনিক মন স্বভাবতই বিদ্রোহ করে। ১৯৩৪-এর বিহার ভূমিকম্পের পরে মহাত্মাজী যখন তাকে ভারতের অস্পৃশ্যতারূপ পাপের জন্যে যোগ্য শাস্তি বলে ঘোষণা করলেন তখন তা বহুর ক্রোধের কারণ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, জহরলাল কেউই গান্ধীজীর সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি। কবির বিবৃতির সমর্থন করে পণ্ডিতজী তাঁর আত্ম-জীবনীতেও ভূমিকম্পের গান্ধীভাষ্যের যুক্তিশূন্যতা দেখিয়ে দিয়েছেন পরম কুশলতায়।

গান্ধীজির উক্তি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ইনকুইজিশনের কথা, জিয়োর্দানো ব্রুনোর কথা, বস্টনের পাদ্রীদের কথা। কিঞ্চিৎ শ্লেষের সঙ্গে পণ্ডিতজী বলেছেন, এই ভূমিকম্প যদি হয়ে থাকে পাপের শাস্তি তবে সে কোন পাপের জন্যে তা জানব কী উপায়ে? অস্পৃশ্যতাই যদি সে পাপ হয়, তাহোলে এই ভূমিকম্প কি দক্ষিণ-ভারতেই হওয়া উচিত ছিল না? আর সে পাপ যে অস্পৃশ্যতাই তাই বা প্রমাণ করবে কে? কন্‌গ্রেসীরা তো বলতে পারে যে বিদেশী শাসন বিনা প্রতিবাদে সহ্য করবার জন্যেই এই অভিশাপ। অপরদিকে ইংরেজ সরকার যদি দাবী করে যে অসহযোগ আন্দোলনের অপরাধেরই শাস্তি এটা, তাইতেই বা বাধা দেবে কে!

সত্যি কথা। এদিক্ থেকে গান্ধীজীর তথা আমার পার্শ্বোপবিষ্ট নেপালী ভদ্রলোকের ব্যাখ্যা যে গ্রহণযোগ্য নয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যাখ্যা কোথায় তাহোলে?

পণ্ডিতজীর প্রতিবাদে মহাত্মাজীর ব্যাখার খণ্ডন আছে হয়তো, কিন্তু ব্যাখার সন্ধান কোথায় এতে ? আর, কোনো ঘটনাকে দুর্ঘটনা বলে বাতিল করে দেওয়াই কি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক ?

তবে ?

আমি আমার নবলব্ধ নেপালী বন্ধুর কাছে সময় কাটানোর জন্যে গল্প শুনছিলেম মাত্র , তাঁকে এত সমস্ত সমস্যার কথা জানাবার প্রয়োজন ছিল না। বর্ণনা শেষ করেও ভদ্রলোক স্মৃতি মন্থনে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ বললেন, "একটার পর একটা যখন পাথরগুলো পড়ে নীচের মানুষদের পিষে মারছিল, মিলা রেপার মা তখন সেখানে থাকলে প্রাণ খুলে হাসতে পারতেন !"

তিব্বত, সিকিম, ভুটান আর এই ত্রয়ীর ভ্রষ্ট শাখা দার্জিলিঙে মারপা আর মিলা রেপার নাম জানে শিশু-বৃদ্ধ সবাই। বৌদ্ধ বিশ্বাসের অপরিহার্য অঙ্গ যে নির্বাণপূর্ব জন্মপর্যায় তার সবগুলি স্তর মিলা রেপা একসঙ্গে অতিক্রম করেছিলেন একটি মাত্র জীবনে। প্রতি বৌদ্ধের উচ্চতম অভিলাষ সেই জন্ম-পর্যায়ের সংক্ষেপণ। মিলা রেপার জীবনী তিনি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন নিজে অর্থাৎ নিজে বলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর শিষ্য লিখে নিয়েছিল। তিব্বতী গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই আত্মজীবনী এবং তার ইংরেজি আর ফরাসী অনুবাদ অবৌদ্ধ বিদেশীদের কাছেও অত্যন্ত সুখপাঠ্য।

মিলা রেপার জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করলেন

আমার নেপালী বন্ধু। কণ্ঠে ছিল ভক্তির সুর, ক্ষুদ্র অক্ষিদ্বয় ছিল মুদ্রিত। বাইরের অবিরাম বর্ষণ বিবৃত্তির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সম্মুখের দোর্জে লামার সমাধি স্মরণ করিয়ে দিল দার্জিলিঙের সঙ্গে তিব্বতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা। ইংরেজ কর্তৃক পুনর্গঠিত দার্জিলিঙে সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে না সুট-পরিহিত ইংরেজিভাষী আধুনিক নেপালীর দৈনন্দিন ব্যবহারে। সে আজ আপন ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে পরসভ্যতার বহিরাবরণ অঙ্গে ধারণ করেছে। আত্মার কথা, ধর্মের কথা ভাববার সময় নেই তার। আমার নেপালী বন্ধু আধুনিক দার্জিলিঙের প্রতিনিধি নন।

মিলা রেপার জীবনের প্রথম অধ্যায় রত্নাকরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যভিচারী হিসেবে তাঁর কুখ্যাতি ছিল বহুবিস্তৃত। পিতৃবিয়োগর পরে পিতৃব্যের প্রতারণায় সম্পত্তিচ্যুত হয়েও মিলার চেতনা হোলো না দেখে দারিদ্র্য-জর্জরিতা বিধবা মা একদিন পুত্রকে বললেন, "যারা তোর বাবার সম্পত্তি চুরি করেছে তাদের যথোচিত শাস্তি যদি না দিতে পারিস তবে তুই তোর পিতৃ-পরিচয় যেন দিস নে কারো কাছে।"

অপমানাহত মিলা রেপা ছুটে গেল কাকার কাছে, সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের দাবী জানাতে। কাকা অবজ্ঞা গোপন না করে স্পষ্টই বলে দিলেন, "দল বেঁধে লড়াই করবার সাহস থাকে তো আয়, নইলে একা বসে শাপ দে। বিরক্ত করিস নে।"

মিলা রেপার সাধ্য ছিল না যুদ্ধ ঘোষণা করবার। সে বেরুলো এমন শাপের খোঁজে যাতে অসাধু কাকার শাস্তিবিধান হতে পারবে। বহুদিন নানা জায়গা পরিভ্রমণ করে সাক্ষাৎ মিলল এমন গুরুর যে তাকে শেখাল সেই ধ্বংসকারী মন্ত্র।

মন্ত্রপ্রয়োগে অযথা বিলম্ব হোলো না।

সেদিন পরস্বাপহরণকারী কাকার গৃহেছিল বিশেষ ভোজের আয়োজন। উপরের তলায় অভ্যাগতরা, নীচে বাঁধা ছিল তাঁদের অশ্ব। মিলা রেপার মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া-গুলি দিশেহারা হয়ে ছুটল চারিদিকে। দাস-দাসী আর অতিথিরা সবাই সেই মারাত্মক মন্ত্রে অভিভূত হয়ে এমন চঞ্চল হয়ে উঠল যে কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত বাড়িটা ভূপতিত হোলো। সেই স্তূপের তলায় নিহত হোলো সকলে।

মাত্র দু'জন ছাড়া।

বাঁচল শুধু কাকা আর কাকিমা। মিলা রেপার দ্বারা অনুষ্ঠিত ক্ষতির পূরো পরিমাণ পরিপূর্ণভাবে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করতে। পুত্রকৃত প্রতিহিংসা সাধনের সংবাদ পেয়ে বিধবা মা ছুটে এলেন হৃতসর্বস্ব দেবর-জায়ের কাটা ঘায়ে তাঁর গভীর তৃপ্তির নুন ছিটিয়ে দিতে।

এদিকে মিলা রেপাকে কিন্তু দেশত্যাগী হতে হোলো কাকার প্রতিশোধের ভয়ে। বিদেশের নিঃসঙ্গতায় মিলার অশান্ত মনের জন্মগত অস্থিরতা এবারে প্রক্ষিপ্ত হোলো আপন মনের দিকে। পূর্বের প্রতিহিংসাপরায়ণতার জন্যে মিলা রেপা দগ্ধ হতে থাকল অনুতাপের অনলে।

তার চেয়েও বেশি সে দগ্ধ হোলো ছোটো কয়েকটা আত্মোদ্ভূত প্রশ্নের আগুনে। জীবনের অর্থ কী? কেন বাঁচব? এই পৃথিবীর বুকে আমার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য কী? লক্ষ্য কী বাঁচবার? বাঁচা কি শুধু বাঁচারই জন্যে? তবে? তার পর? এর পর?

অস্থির মিলা আবার পথ নিল।

এবারে এমন গুরুর সন্ধানে নয় যে তাকে শত্রু নিধনের মন্ত্র দেবে। এবারে তার চাই এমন গুরু যে তাকে শেখাবে অন্তর থেকে সকল বিদ্বেষ-বিষ নাশ করতে। যে তাকে বলে দেবে তার প্রশ্নগুলির উত্তর। যে তাকে বলে দেবে তার নির্বাণের পথ।

অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল এক পুরানো পরিচিতের সঙ্গে। তারই কাছে মিলা রেপা মারপা নামটি শুনল। শোনা মাত্র মিলা তার সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করল যে এই মারপা তাকে তার পথ দেখাতে পারবে।

মারপা। মারপা।

পারবে তো। কিন্তু দেখাবে কি? লোব্রকে পৌঁছে মিলা তার লামার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে উৎসাহ পেল না। মারপা অন্তর্দৃষ্টির বলে আগেই জানতেন, মিলা আসছে তাঁর কাছে। কিন্তু ভাবী শিষ্যকে বুঝতে দিলেন না সে-কথা।

মিলা যখন তার সব কিছু লামার পায়ে সমর্পণ করে মন্ত্র ভিক্ষা করল, মারপা কপট ক্রোধে চেঁচিয়ে বললেন, "কী? মন্ত্র নেওয়া কি এতই সোজা! যে মন্ত্র আমি নিজে লাভ করেছি

দীর্ঘ কালের কঠোর তপস্যায় আর কৃচ্ছ্র-সাধনে, তাই বুঝি তুলে দেব প্রথম আগন্তুকের হাতে? বাপু হে, সিদ্ধিলাভ এত সোজা নয়।"

মিলা কিন্তু দমল না। বুঝল সে তার সত্যাগ্রহের পরীক্ষা হবে। লামার পায়ে আবার তার প্রতিজ্ঞা নিবেদন করে শপথ করল, যে কোনো সর্তে সে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

মারপার অধীনে মিলা রেপার শিক্ষা সুরু হোলো।

শিক্ষাই বটে! মন্ত্রদানের পূর্বে মারপা তাঁর শিষ্যকে যে ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন তাকে অগ্নি-পরীক্ষা বললে অল্প-ভাষণের অপরাধ হবে। সেই পরীক্ষার কাহিনী মিলা রেপার আত্ম-জীবনীতে বিবৃত আছে বিশদ ভাবে। তা পাঠ করলে যে কোনো অ-তিব্বতীয়ই বিস্ময়ে হতবাক্ হবে। হয়তো বা তার আপাত অসঙ্গতি অবিশ্বাসীর হাস্যোদ্রেক করবে।

একদিন মারপা মিলাকে ডেকে বললেন, "দেখ্, ওই যে গ্রামটা দেখছিস ওই গাঁয়ের লোকেরা একদিন আমায় অপমান করেছিল। তুই তো ধ্বংসের মন্ত্র জানিস। ওই পুরো গাঁয়ের সব প্রাণীকে নাশ করে দে তোর শক্তি দিয়ে। তবে আমার শান্তি হবে।"

গুরুর মুখে এ কেমন আদেশ? মিলার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। যাঁর কাছে নিতে এসেছি ক্ষমার মন্ত্র, দয়ার দীক্ষা,—তিনিই কি না আদেশ দিলেন এত শত প্রাণীর বিনাশের? তার মনে জাজ্জ্বল্যমান ছিল তার পূর্বকৃত ধ্বংসের

অবিস্মরণীয় স্মৃতি। তার জন্যে অনুতাপ আজো তাকে অস্থির করে তোলে সারাক্ষণ। আবার সেই ধ্বংস, এবং তা গুরুর আদেশে!

কিন্তু মিলা রেপা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এই অবোধ্য আদেশকে মনে করলে নতুন এক পরীক্ষা বলে। আজ্ঞা পালন করল অবিলম্বে।

"আবার এতগুলি প্রাণীকে হত্যা করল? তা আবার কোনো কারণ না জেনে, কেবল মাত্র একজন লোকের কৌতুকের জন্যে?" আমি অসহিষ্ণু ভাবে জিজ্ঞাসা না করে পারলেম না।

নেপালী বন্ধু মৃদু হাস্যে উত্তর দিলেন, "অপরের কৌতুকের জন্যে নয়। তার নিজেরই শিক্ষার জন্যে। মারপার আদেশ বিশেষ অর্থপূর্ণ।"

"যে শিক্ষক বেত মেরে 'বেত্র' বানান করতে শেখাবে এবং কাউকে মেরে 'হত্যা' লিখতে শেখাবে, তার পদ্ধতির প্রশংসা করতে পারব না। তা আপনি যতই অর্থপূর্ণতার কথা বলুন।"

আমার মন্তব্য উপেক্ষা করে ভদ্রলোক বললেন, "মারপার আদেশের তাৎপর্যই হচ্ছে বৌদ্ধ শিক্ষার গোড়ার কথা। বৌদ্ধদের কাছে জ্ঞানলাভের যত মূল্য এমন আর কারো কাছে নয়। একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মেই অজ্ঞতা অক্ষমণীয় পাপ বলে পরিগণিত। জানি নে বা জানে না—এ জন্যে ক্ষমা নেই কোনো বৌদ্ধের। আর এই জ্ঞানলাভের প্রথম কথাই হচ্ছে

উপলব্ধি। মিলা রেপা যাতে সম্পূর্ণরূপে প্রাণনাশের নৃশংসতা উপলব্ধি করতে পারে সেই জন্যেই মারপা ওই আদেশ দিয়েছিলেন।"

"সেই শিক্ষার জন্যে এক গ্রাম নরনারী এবং পশুপক্ষী প্রাণ দেবে এটা কি অন্যায় নয়?"

"আপনি আমাকে আমার কথা শেষ করতে দেননি। মারপা তাদের সবাইকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাণ নিতে বলবার অধিকার একমাত্র তারই আছে যার প্রাণ দেবার ক্ষমতা আছে। সে শক্তি মারপার ছিল ব'লেই তিনি এমন আদেশ দিতে পেরেছিলেন।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী আমি। হত্যার কথা, ধ্বংসের কথা সহজেই বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু জীবনদানের কথা শুনলেই অবিশ্বাস ঘনিয়ে আসে। এই প্রথম মনে হোলো যে, যা শুনছিলেম তা খবরের কাগজের রিপোর্ট নয়।

যুগ যুগ ধরে এ কাহিনী বহু বিশ্বাসীর ভক্তিরসে সিঞ্চিত হয়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে। অবৌদ্ধ অবিশ্বাসীর কাছে এ কাহিনী মনোরম উপকথা মাত্র। কিন্তু বিশ্বাসী বৌদ্ধ আজো এ কাহিনী ভক্তিনত চিত্তে স্মরণ করে হৃদয়ে সেই অপরিসীম প্রশান্তির স্পর্শ অনুভব করে যা তার জীবনকে করে তোলে ছন্দোময়, যা তার গতিকে দেয় স্থির লক্ষ্য আর প্রাণকে দেয় অবিচল আনন্দ।

আমার বন্ধু তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে রহস্যময় স্বরে

দূরে অদৃশ্য গৌরীশৃঙ্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "ওই যে মাউণ্ট এভারেস্ট তার কাছে অনেকগুলি গুহা আছে। মিল রেপা তাঁর শেষ জীবন ওই গুহাগুলিরই মধ্যে ধ্যান করে কাটিয়েছিলেন।"

একটু থেমে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে যোগ করলেন, "বেশ উঁচু আর বেশ দূর। রওনা হতেই বড়ো দেরী হয়ে গেল। জানি না পৌঁছোতে পারব কি না।"

এটা স্বগতোক্তি।

এগারো

উপহাস করতে এসে উপাসনার জন্যে থেকে গেছে, বাইবেলে এমন লোকের উল্লেখ আছে। আমার ভাগ্য তার ঠিক বিপরীত। আমি যাই উপাসনায়, ফিরি উপহাস করে। আমি যাই দেবদর্শনে, ফিরি মন্দির পরিদর্শন করে।

মহাকালে সেই নেপালী ভদ্রলোকের মুখে মিলা রেপার কাহিনী শুনছিলেম মন দিয়ে। কিন্তু যেই মাত্র কাহিনীর একটা অংশ একটু মাত্র অবিশ্বাস্য মনে হোলো অমনি তাকিয়ে দেখলেম বৃষ্টি থেমেছে কিনা। কমেছে দেখেই ফিরে এলেম ভদ্রলোকের নাম পর্যন্ত জিজ্ঞাসা না করে। তাঁর অবিচল বিশ্বাসের প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরেছিলেম, এমন বললে মিথ্যা বলা হবে।

কিন্তু কৌতূহল উদ্দীপিত হয়েছিল অনেকখানি। ভদ্রলোক সম্বন্ধে ততটা নয় যতটা তাঁর বিশ্বাস, তাঁর লক্ষ্য সম্বন্ধে।

তাই গিয়েছিলেম ঘুমের মনাস্টেরি দেখতে। চার মাইল দূরে দার্জিলিং থেকে প্রায় ছশ ফিট উপরে অবস্থিত এই তিব্বতী মন্দিরটির খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত। ওল্ড্ ক্যালকাটা রোড ধরে পথে আরোহণ করতে করতে চোখে পড়ে পথের হু'ধারে অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড, ১৮৯৯ সালের ল্যাণ্ডস্লাইডের সাক্ষ্য ওরা। আঁকাবাঁকা অনেকগুলি রাস্তা অতিক্রম করে ঘুম বাজারের মধ্য

দিয়ে মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করায় ক্লেশ আছে, কিন্তু ক্লান্তি নেই। ক্লেশের পর্যাপ্ত পুরস্কার মেলে মন্দির দর্শন করলে।

মন্দিরটি তেমন প্রাচীন নয়—বয়স পঁচাত্তরেরও কম। মাত্র তিরিশ বছর আগে চম্প বা মৈত্রেয় বৌদ্ধের মূর্তি এখানে স্থাপিত হয়েছে। মূর্তির অভ্যন্তরে আছে বৌদ্ধ শাস্ত্রের ষোলখানি গ্রন্থ। দর্শকের চিত্ত চমৎকরণের জন্যে ওখানে এমন বলবারও লোক রয়েছে যে, মূর্তির ভিতর শুধু পুঁথিই নেই, হীরা মাণিক্যও সঞ্চিত আছে অজস্র। আমার গাইডের মতে এতে মূর্তির মূল্য নিশ্চয়ই বহু গুণ বর্ধিত হয়েছে! কিন্তু যাক সে কথা, পুরোহিত দিয়ে কি মন্দিরের বিচার হয়?

স্বল্পালোকিত এই মন্দিরটির ভিতরের চারটি দেয়ালই পুঁথি কিম্বা দীপ দিয়ে ঢাকা। সেই অসংখ্য প্রদীপগুলিতে তেল দেবার জন্যে নিযুক্ত আছে বেশ কয়েক জন পীতপরিহিত পুরোহিত। তার অনেকগুলি জ্বলছে কিন্তু তবু মন্দিরের ভিতরের বেশির ভাগ জায়গাই অন্ধকার। শুধু মাঝখানে—যেখানে সুবৃহৎ মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত—সেই স্থানটি আলোকে উজ্বল। সে আলো প্রদীপের না মূর্তির, আজো তা শপথ করে বলতে পারব না।

মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র নিজের অজ্ঞাতসারে যে অবর্ণনীয় অনুভূতি দ্বারা আচ্ছন্ন হলেম, তার প্রকাশের চেষ্টা করতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। অপরের উপলব্ধির জন্যে অনুভূতির ভাষা দিতে হয় অনুরূপ অনুভূতির প্রতি ইঙ্গিত করে। কিন্তু যে অনুভূতি একেবারেই অনন্য, যার সঙ্গে আর কোনো আনন্দ-

বেদনা-বিস্ময়ের সামান্যতম সাদৃশ্যও নেই, তাকে বোঝাব কেমন করে? এই মন্দিরের গঠনচাতুর্যের বর্ণনা দিতে পারি, এখানকার পুরোহিতদের ধূসর বেশের বর্ণবিন্যাস নিয়ে বাক্যবিন্যাস করতে পারি। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তির আকৃতির বিরাটত্ব বা প্রকৃতির মহত্ব নিয়ে বিস্তার করতে পারি বাগজাল। কিন্তু তাই দিয়ে আমার অনুভূতির রহস্যের সামান্যই সঞ্চারিত হবে আর কারো মনে।

সে সময় নৈঃশব্দ্য এই মন্দিরে যে ভাষায় কথা কয়, তার মর্ম আমি জানিনে, তার অনির্দেশ্য রূপ আমার দৃষ্টিতে ধরা দেয় না, চতুর্দিকের পুঁথিপুঞ্জের লিখিত জ্ঞানের অধিকাংশই আমার বুদ্ধিবহির্ভূত, তার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও আমার বোধবহির্ভূত। কিন্তু, হায়, সেখানেই বা শেষ করে দিতে পারি কই! যে-অনুভূতির ভাষা নেই, রূপ নেই, এমন অনুভূতি তবু কেন আচ্ছন্ন করে আমার সমগ্র সত্তাকে? ফলে যা নাকি অর্থপূর্ণ তারও অর্থ বুঝিনে—এদিকে আর সব কিছুকে মনে হয় অর্থহীন বলে!

তাই ফিরে গেলেম মহাকালে, সেই নেপালী বন্ধুর সন্ধানে না জানতেম তাঁর নাম, না তাঁর ঠিকানা।

সেই একই জায়গায় গিয়ে তৃতীয় দিন একই সময়ে অপেক্ষা করছিলেম। সেখানে হিমালয়ের নানা শৃঙ্গের যে বিশদ মানচিত্রটি আছে, তাই দেখছিলেম। কোনটির কত উচ্চতা আর কোনটির অবস্থান কোথায়, তার নির্দেশ আছে এই মানচিত্রে। আমার আশ্রয়টির কিছু দূরেই ছিল মহাকাল

গুহার মোহানা। এ-গুহা কোথায় গেছে জানিনে। কেউ কেউ বলে এই সুড়ঙ্গের পথে তিব্বতের রাজধানী লাসায় যাওয়া যায়। এ নিয়ে যে মতভেদ আছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, আধুনিক ইতিহাসে কেউ সাহস করেনি এ-পথে লাসা যাবার চেষ্টা করতে।

সেই গুহারই মোহানার দিক থেকে হঠাৎ সেই নেপালী ভদ্রলোক কোথা থেকে আবির্ভূত হয়ে হেসে বললেন, "কী, এ পথে লাসা যাবেন নাকি ?"

আমি হেসে বললেম, "তিন দিন আগে ঘুমে গিয়েছিলেম হেঁটে, তারই পায়ের ব্যথা এখনো যায়নি।"

"হঠাৎ ঘুমে যে ?"

"এমনি।" আর কিছু বলতে পারলেম না।

"কী দেখলেন ?"

যা দেখেছি তার চাইতে যা দেখিনি তাই যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সে কথা বলতে পারলেম না। যে-সংশয় নিয়ে ঘুম থেকে ফিরেই মহাকালে এসেছিলেম এ বিশ্বাসীরই সন্ধানে, তার কথাও বলতে পারলেম না।

আমার কাছ থেকে তাঁর সহজ প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ভদ্রলোক বললেন, "মন্দিরে প্রার্থনা করতে পূজারী হেঁটে যেতে পারে, কিন্তু ম্যুজিয়ম দেখতে দর্শক তো যায় গাড়িতে। আপনি কেন পায়ে ব্যথা করতে গেলেন ?" ভদ্রলোকের মৃদু হাসিতে স্নিগ্ধ কৌতুক ছিল, কিন্তু কঠোর শ্লেষের আভাস মাত্র ছিল না। আমি চুপ করে রইলেম। ভদ্রলোকও।

আমার মনের মধ্যে ঘুরে ফিরছিল একটা অন্ধ, অস্পষ্ট অস্বস্তি। অপর দিকে আমার পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোকের আনন ছিল গভীর শান্তির নিশ্চিত আলোয় উদ্ভাসিত। কোথায় পাবো এই শান্তির সন্ধান? কে আমায় বলে দেবে? আমার না আছে আত্মসচেতনতা পরিহার করে আত্মসমর্পণ করবার বিনয়, না আছে আত্মসমর্পণের দুর্বলতা জয় করে পূরোপূরি আত্মসচেতন হবার সাহস। আমি নিজেকে করি অবিশ্বাস, ঈশ্বরে করি সন্দেহ। আমার পাখা নেই আকাশে ওড়বার মতো, শিকড় নেই ভূমিতে স্থির হবার মতো। ডাঙায় আমি হাঁপিয়ে উঠি, জলে নামতে পারিনে সাঁতার জানিনে বলে!

ভদ্রলোক স্থিরনেত্রে দূরের হিমালয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন। আমার অস্তিত্বের কথা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিলেন, কেন না ধীর স্বরে যা বললেন, তা আমার উদ্দেশে বলার কোন কারণ ছিল না। তার ভাষা আমি জানিনে। কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "পোঁছোতে পারব, কি বলেন?"

"কোথায়?"

"সেদিন বললেম যে, ওই হিমালয়ের শীর্ষের কাছাকাছি।"

"কেন যাচ্ছেন অত দূর? এই বয়সে?"

"কেন? না গিয়ে পারব না বলে।" একটু হেসে যোগ করলেন, "অনেক দিন তো অপব্যয় করেছি অজ্ঞানের অন্ধকারে মিথ্যার ধাঁধাঁয়। এবারেও কি জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তির সন্ধান করবার সময় হয়নি?"

এই উক্তির পৃথক পৃথক কথাগুলির অর্থ আমার অজানা

নয়, কিন্তু এর সামগ্রিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করবার সামর্থ্য নেই আমার। বললেম, "বুঝলেম না কিছু।"

"আমিই কি ছাই বুঝি? আর, বুঝিনে বলেই তো চলেছি ওদিকে, যাতে অন্তত চেষ্টা করতে পারি বুঝবার।"

"কিন্তু ওখানে উঠে যদি বুঝতে হয়, তাহোলে তো ভয়ের কথা। পৌঁছোবার আগেই তো···" আমি শেষ করতে গিয়ে বুঝলেম যে, যা বলতে যাচ্ছিলেম তা বলার নয়। বিব্রত বোধ করলেম।

ভদ্রলোক কিন্তু আদৌ বিব্রত হলেন না, "বুঝেছি কী বলতে যাচ্ছিলেন।" হেসে বললেন, "আর শেষ হলেই বা কী। এ তো শেষ নয়, যতি মাত্র, আবার স্নুরুর আগে একটু বিরাম শুধু। একবার মৃত্যুর দরজা দিয়ে কোনোক্রমে বেরিয়ে গেলেই যদি মুক্তি পাওয়া যেত তাহোলে আর ভাবনা ছিল কী? তাহোলে তো সারাটা জীবন ওই প্লিভায় বা ভুটিয়া বস্তীতে কাটিয়ে দিলেই হোতো। না, অত সোজা নয়, অত সোজা নয়।"

পুনর্জন্মে আমি বিশ্বাসও করিনে, অবিশ্বাসও করিনে। কিন্তু এই জীবনটার জন্মেই স্নুরু এবং মৃত্যুতেই শেষ—তার আগেও অর্থহীন মহাশূন্য এবং তার পরেও অর্থহীন মহাশূন্য—এই কথাটাও মেনে নিতে বাধে।

যা নিজেই ভালো করে জানিনে, তা নিয়ে কিছু বললেম না আর। শুনতেই ভালো লাগছিল।

"আমাদের অস্তিত্ব যদি হয় বিরাট একটি গ্রন্থ, তাহোলে এই মনুষ্য জীবন তো তার মাঝামাঝি একটা অধ্যায় মাত্র।

আগের আর পরের অধ্যায়গুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করে মাঝের অধ্যায়ের অর্থ খুঁজতে গেলে জীবনকে যে অর্থহীন মনে হবে, তাতে আর বিস্মিত হবার কী আছে ?”

“কিন্তু দুটোই যে অজানা !”

“জানতে হবে, এইটেই তো আমার ধর্মের গোড়ার কথা। ভগবান বুদ্ধের বাণীর মধ্যে, যা চতুঃসত্য নামে বিখ্যাত, তার ভিত্তিই হচ্ছে জ্ঞান, উপলব্ধি। মানবজীবনের বৃহত্তম সমস্যা যে দুঃখ, তার সাময়িক নিরসনের জন্যে আপনার সভ্য জগতে অ্যাস্পিরিন আছে অসংখ্য, কিন্তু সেই সর্বব্যাপী দুঃখের অবসানের জন্যে কোনো চিকিৎসা জানা নেই সে জগতের। তার কারণ দুঃখের কারণই যে তাদের কাছে অজ্ঞাত। তাই রোগের বাইরের উপসর্গের উপশমের জন্যে আপনারা উদ্ভাবন করেছেন নানা পানীয়, নানা দৃশ্য, নানা খাদ্য, নানা ভোগ্য। কিন্তু রোগের কারণ যার জানা নেই, সে রোগের বারণ করবে কী করে !”

এই কথাগুলির অনায়াসেই সর্বজ্ঞতার দম্ভের মত শোনাতে পারতো। কিন্তু শোনায়নি। স্নিগ্ধ আন্তরিকতার সুরটি কানে বড়ো মধুর হয়ে বাজছিল। কেন না অপরের অজ্ঞানতায় অসহিষ্ণুতা ছিল না বক্তার মনে। ছিল সবেদন অনুকম্পা।

“আর এই কারণ জানিনে বলেই তো জন্মচক্র নিরন্তর ঘুরে ঘুরে চলেছে, থামছে না। তাই আমি আকুল, আপনি ব্যাকুল, দু'জনেই অস্থির। আপনি এসেছেন দার্জিলিঙে, আমি চলেছি আরো উপরে।”

আমার ব্যক্তিগত বিষয়ে এমনিতর মন্তব্যে অন্য সময় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হতেম। এখন সে সব কথা মনে ছিল না। প্রায় নিজেরই অজ্ঞাতসারে নিম্নস্বরে বললেম, "আপনি অন্তত জানেন যে কিসের সন্ধানে যাচ্ছেন, আমি যে কেন এসেছি তাও জানিনে, যদিও ফিরে যাওয়ার দিন এগিয়ে এলো!"

"আমিও যে ঠিক জানি, এমন বলবার ঔদ্ধত্য নেই আমার। তবে সম্প্রতি আমার লামার কাছে যে ক'টি সূত্র শিখেছি তা'রই সাহায্যে জানতে চেষ্টা করছি, এইটুকুই বলতে পারি।"

আমার দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা ছিল।

"সংক্ষেপে বলতে গেলে সূত্র চারটি। প্রথম সুস্পষ্ট এবং একেবারে অনস্বীকার্য সত্য হচ্ছে দুঃখ। সকল প্রকার জীবনের অস্তিত্বেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে দুঃখ। এই দুঃখ এড়াবার উপায় নেই, এ থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। জন্মচক্রের প্রতি স্তরে অপেক্ষা করছে এই দুঃখ। তাই জন্মচক্রের মধ্যে আনন্দের সন্ধান ব্যর্থ হতে বাধ্য—এ যেন অন্ধকার ঘরে চোখ বুঁজে অনস্তিত্ব কালো বিড়ালের অন্বেষণে হাতড়ে বেড়ানো। অনস্তিত্ব কালো বিড়ালটি হচ্ছে আনন্দ, অন্ধকার ঘরটি হচ্ছে জন্মচক্র আর অন্ধ সন্ধান হচ্ছে মানুষের অজ্ঞ বাসনা।

"দুঃখের মূল কারণ হচ্ছে অজ্ঞান, এইটিই হল দ্বিতীয় সূত্র। এ কিসের অজ্ঞান? এ অজ্ঞান আমাদের পারিপার্শ্বিক সব কিছুর সত্যকার প্রকৃতি সম্বন্ধে, আমাদের সঙ্গে সেই সবের সম্বন্ধের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে। এই অজ্ঞান শুধু অজ্ঞতা নয়,

তাই এ থেকে মুক্তিও অধ্যয়নে নেই। এই অজ্ঞানের উত্তর হচ্ছে জ্ঞান আর জ্ঞানের গোড়ার কথাই হচ্ছে উপলব্ধি। জ্ঞান দিয়ে অজ্ঞানকে দূর করতে হবে আর অজ্ঞান দূর হলেই দুঃখ দূর হবে। এই হোলো তৃতীয় সূত্র। চতুর্থ সূত্রটি এ থেকে অভিন্ন এবং তেমনি সহজ। তা হচ্ছে আমার উপমার সেই অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া, জ্ঞানের দ্বার দিয়ে অজ্ঞানের ব্যূহ থেকে বেরিয়ে উপলব্ধির মুক্ত আলোয় চোখ খোলা। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের অবলোপসাধন হলেই অবসান হবে অজ্ঞ বাসনার, অজ্ঞ বাসনা নিঃশেষ হলেই শেষ হবে অজ্ঞ কর্মের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি, আর তার সঙ্গেই থামবে জন্মমৃত্যুর পুনরাবর্তন। কেন না সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের প্রতি কাজেরই উৎস হচ্ছে কোনো না কোনো বাসনা আর প্রতি বাসনাই তো অজ্ঞানের সন্তান।

"কর্মের শেষ হলে জন্মচক্রের ঘূর্ণনেরও শেষ হতে বাধ্য, কেন না পরিপূর্ণ জ্ঞান যেখানে বিরাজ করবে সেখানে তো সব কিছু পূর্ণতা লাভ করেছে, সেখানে আর পরিবর্তনের অবকাশ কোথায়? সেই যে কর্মাতীত, স্থির, অপরিবর্তনীয় পূর্ণতা, তাকেই বলি মুক্তি, মোক্ষ, নির্বাণ।"

ভদ্রলোক আবার দূরের হিমালয়ের পানে তাকালেন।

তাঁর তর্করীতি পূরোপূরি অনুধাবন করতে পারি এমন সাধ্য নেই আমার। কিন্তু তাঁর কাছে যে এই যুক্তি নিতান্তই সহজ সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বুদ্ধি আমার চাইতে তীক্ষ্ণ, একথা স্বীকার করতে বাধল। কিন্তু

তাঁর বোধ যে অজস্রগুণ সূক্ষ্মতর, সেকথা অস্বীকার করতে পারলেম না।

বুদ্ধির সর্বক্ষমত্বে সন্দেহ জন্মেছিল আগেই, তাই বোধকে অবজ্ঞা করবার দুর্বুদ্ধি আর নেই। আর, সাধারণত এ দু'য়ে যে সন্ধিবিহীন বিরোধ আছে বলে মনে করা হয়, তাও ঠিক বলে মানিনে; কোনো যুক্তি আমার বুঝবার মতো সহজ নয় বলেই তাকে অসত্য বলে ঘোষণা করব, এমন ঔদ্ধত্যও আজ আর নেই।

"কিন্তু আমার প্রতিপাদ্য যত সহজে বিবৃত করে গেলেম, তার সিদ্ধি কিন্তু আদৌ সহজ নয়। বহু সংখ্যক পর্যায় অতিক্রম করতে হয়, বহু জন্মের বহুতর সুকৃতির মধ্য দিয়ে তবেই ঘটে সিদ্ধিলাভ। মিলা রেপার মতো অসাধারণ শক্তি তো আর সকলের নেই যে, কিণ্ডারগার্টেন থেকে সোজা সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হবে। তাই আমাদের দুর্গম, সোজা পথ অতিক্রম করতে হবে প্রতি মুহূর্তের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায়। শর্টকাট নেই স্বর্গের।"

ভদ্রলোকের বিশ্বাস-বিশুদ্ধ চিন্তাধারা যে আমার কাছে এ-পর্যন্ত স্বচ্ছ স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছিল তা নয়। অনেকটাই তার বুঝিনি। কিন্তু এই জন্মপর্যায়ের কথা যদি মেনেও নিই, তাহোলেও প্রশ্ন থাকে তার পর কী? অজ্ঞান নেই, অতএব বাসনা নেই, অতএব কর্ম নেই, অতএব আর জন্ম নেই—কিন্তু তারপর? নির্বাণোত্তর স্থিতির রূপটা কী রকম? আমার প্রশ্ন নিবেদন করলেম।

"জানিনে। জানলেও হয়তো বলতে পারতেম না। নির্বাণোত্তর অবস্থার সঙ্গে আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার একটুকু মিল নেই কোনোখানে ; জাগতিক পরিভাষায় তার বর্ণনা হবে কী করে ? বর্ণনা করতে গেলেই হাস্যকর হবে।

"দেখুন না, আমাদের পরিকল্পিত স্বর্গের চেহারাটা কেমন।"

"দরিদ্রকে জিজ্ঞাসা করুন তার কোন স্বর্গে সাধ। সে বলবে, এমন জায়গা যেখানে অভাব নেই, যেখানে সে যা চাইবে তাই পাবে। তাকে যদি বলি, স্বর্গে অভাব নেই, কেন না প্রয়োজন নেই। পাওয়ার প্রশ্নই অবান্তর কেননা চাওয়াই নেই, সে নিশ্চয় বলবে—অমন স্বর্গে কাজ নেই তার। ইসলামী স্বর্গের সহজলভ্য বস্তুগুলির তালিকা আপনি জানেন নিশ্চয়ই। সে তো স্বর্গ নয়, সে শুধু কামনা-কণ্টকিত এই পৃথিবীরই রাজ-সংস্করণ। ঠিক তেমনি নির্বাণের পরের নিরস্তিত্ব স্থিতির কথা বললেও এমনি হাস্যকর হবে।"

আমার নির্বোধ প্রশ্নের জন্যে লজ্জিত হলেম।

"আমাদের স্বর্গের কল্পনা রূপায়িত হয় আপন ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে। এই চিরন্তন আমিত্বই যদি ভ্রান্ত হয়, তাহোলে সে ভিত্তির উপর নির্ভরশীল সব কিছুইও তো সমান ভ্রান্ত হতে বাধ্য। এই আমিত্বই তো মুক্তির বৃহত্তম অন্তরায়, এর অবসানই তো নির্বাণ।"

এখানে এসেই পূর্বেও বহুবার ঠেকেছি। আমি নেই, অথচ আমারই নির্বাণ ; আমার শেষ হলে যার সুরু, সে কে ? আর

আমিই যদি না রইলেম, তাহোলে আর কার কী হোলো বা না হোলো তাতে আমার কী ?

এই যে পরিপূর্ণ আমি-স্বাধীন চিন্তা এতে আমি একেবারেই অক্ষম। আমার সকল চিন্তা সকল কর্মের উপর আমার ব্যক্তিত্ব প্রক্ষিপ্ত হয় সকল সময়। বাকী পৃথিবী থেকে সেই ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি পৃথক নয়, তার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ আছে। কিন্তু সেই ব্যক্তিত্ব থেকে পৃথক পৃথিবীর অস্তিত্বই নেই আমার কাছে।

আমি গেলে আমার আর রইল কী ?

অসম্বন্ধ ভাষায় আমার অসম্বন্ধ সন্দেহ জানাতে ভদ্রলোক বললেন "এই নির্ব্যক্তিক অস্তিত্ব যে কী তা ঠিক আপনাকে ভাষায় বোঝাতে পারব না বোধ হয়। তবে কয়েক বছর আগে এক ইংরেজ পর্যটক এসেছিলেন এদিকে ; তাঁর লামা এবং আমার লামা একই লামার কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাই এখানে পরিচয় হয়েছিল। তিনিও এসেছিলেন অবিশ্বাস নিয়ে বা শুধু কৌতূহল নিয়ে ; ফিরে গেছেন গভীর ভক্তি নিয়ে। তাঁর কাছে একটা উপমা শুনে-ছিলেম। আপনার ভালো লাগতে পারে।

"জীবনপ্রবাহ কথাটা প্রচলিত। তাই থেকে জীবনকে মনে করুন একটা নদী বলে, সে-নদীর জল হচ্ছে মানুষের কাজ। নদী আপন বেগে পাগল-পারা, সে বেগের, সে উন্মাদনার উৎস হচ্ছে অজ্ঞানজাত কামনা। সে-কামনা যে অবিমিশ্র অমঙ্গল তা নয়—নদী যেখানে বয়ে যায় সেখানে ভূমি হয়

উর্বর, সে-নদী তৃষ্ণা মেটায় কত জনের। কিন্তু নদীর শ্রেষ্ঠ সার্থকতা তো তা নয়। তার গতির লক্ষ্য তো পূর্তবিভাগের সহকারিতা নয়, তার আসল লক্ষ্য সাগর। সে ছুটে চলেছে সেই দিকে—পথে কোথাও গড়েছে, কোথাও ভেঙেছে, কিন্তু থামেনি কোথাও। সেই সাগরে পৌঁছোলে তবেই নদী পূর্ণতা লাভ করল, নিজের পৃথক সত্তা হারিয়ে সার্থক হোলো।

"তখন কে বলবে সাগরের কোন জায়গার জল কোন নদীর? জলের কোন অংশ তখন মাথা তুলে বলবে, আমি পদ্মা আর আমি ইচ্ছামতী? অথচ পদ্মা আর ইচ্ছামতী দুই-ই যে সাগরে মিশে আছে তা তো অস্বীকার করা যাবে না। তাদের পূর্বেকার পৃথক অস্তিত্বের ব্যবহারিক তাৎপর্য আছে মানচিত্রকরের কাছে কিন্তু, নদী দু'টির দিক থেকে, তারা সার্থক হয় তখনি যখন তারা সাগরে এসে হারিয়ে যায়। সেই তাদের পূর্ণতা।

"নির্বাণের পরে মানুষেরও পূর্ণতা সেই রকম। এই পূর্ণতা, এই নির্বাণ—যা লাভ করলে সকল প্রাণী, সকল বস্তু বুদ্ধ—সে তো আমাদের জন্ম-পর্যায়ের অন্তিম স্তর নয়, সে একেবারে এই পর্যায়ের বাইরে, তাই তার রূপ নিয়ে আলোচনা অযথা কালক্ষয় মাত্র। মানুষের তার আগের অবস্থাগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকাই যথেষ্ট। কেন না আমাদের বর্তমানের প্রতি মুহূর্তের কার্য এবং চিন্তা দিয়েই নির্ধারিত হচ্ছে আমাদের পথের দৈর্ঘ্য এবং লক্ষ্যের দূরত্ব।"

দূরে কাঞ্চনজংঘা ঢাকা ছিল একদল মেঘের পিছনে ধীরে ধীরে মেঘগুলি ভেসে গেল অন্যদিকে, কাঞ্চনজংঘা আবার

প্রতিভাত হোলো অবর্ণনীয় শুদ্ধশুভ্রতায়। পৃথিবী অর্থহীন এবং অসার কি না মনে এলো না, কিন্তু দূরের দুর্গম গিরিশৃঙ্গকে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় মনে হোলো। ভদ্রলোকের হিমালয় যাত্রার অভিলাষ নিছক বিলাস বা পাগলামি বলে আর মনে হোলো না। তিনিও ছল ছল চোখে তাকিয়েছিলেন হিমালয়েরই দিকে।

আমার তর্কতূণ যেন শূন্য হয়ে গেল। বললেম, "আচ্ছা, আপনি যা বললেন, সে লক্ষ্যে পৌঁছবার হিমালয় ছাড়া কি আর পথ নেই? মনুষ্যসমাজ ত্যাগ না করলে মানুষের নেই শান্তি?"

"না, তা নয়। প্রকৃত শান্তি হৃদয়ে, পরিবেশ বড়ো জোর সহায়তা করতে পারে, তার বেশি নয়। সেই হৃদয় যার সকল বাসনার ঊর্ধ্বে ওঠেনি, সে গৌরীশৃঙ্গের সর্বোচ্চ শিখরে উঠলেও উদ্বিগ্ন থাকবে। শান্তি পাবে না। অপর দিকে যার উপলব্ধি হয়েছে, তার পক্ষে সংসারের সব কিছুর মধ্যে পরিবৃত থেকেও নিরাসক্ত থাকা সম্ভব। গুরু মারপা তাঁর শিষ্য মিলা রেপাকে আদেশ দিয়েছিলেন সংসারের সব কিছু ত্যাগ করে ধ্যানে মগ্ন হতে, অথচ তিনি নিজে কাজ করে গেছেন পৃথিবীর কোলাহলের মধ্যে; বিবাহ করেছেন, চাষ করেছেন আর সকলের মতো। যে যার প্রকৃতি এবং রুচি এবং সাধ্য অনুযায়ী পথ বেছে নেবে, সেই পথেই তার মুক্তি।"

"আপনি কি না বেছে নিলেন হিমালয়ের পথ?" দুর্গম বন্ধুর পথ যেন আমাকেই অতিক্রম করতে হবে।

"হ্যাঁ, এই পথই বেছে নিয়েছি। এত দিন তো এখানে রইলেম। মন কেবলি এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হতে থাকে, নানা বাজে কাজে বেলা যায়, তাই ডাক আর উপেক্ষা করব না। একবার তাকিয়ে দেখুন না ওই হিমালয়ের দিকে, কে উপেক্ষা করতে পারে তার আহ্বান? ওখানকার ওই নিভৃত নির্জনতার আহ্বান আমার কানে আজ ছাপিয়ে গেছে পৃথিবীর সকল বন্ধু-পরিবার-পরিজনের আহ্বানকে। তাই সব ছেড়ে চলেছি, এক মূহূর্তের জন্যে এতটুকু বেদনা বোধ হচ্ছে না বিয়োগের জন্যে; সব কিছু ছাড়তে পারায় মন পরিপূর্ণ হয়ে আছে গভীর পরিতৃপ্তিতে। ওখানে যদি পৌঁছোতে পারি ভালো, পথেই যদি শেষ হয়ে যাই তাহোলেও এই পরিতৃপ্তি নিয়ে মরতে পারব।"

ভদ্রলোকের স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দূর পাহাড়ের উপর। আমাকে যখন ওই কথাগুলি বলছিলেন, তখন তাঁর আরক্তিম আননে যে সুস্পষ্ট আনন্দোজ্জ্বল আভা ছিল, তা শুধু শৈলবাস-লব্ধ স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে মনে করা আমার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। ভদ্রলোক মনে-মনে তিব্বতীয় ভাষায় কয়েকটা শ্লোকের আবৃত্তি করছিলেন। সে স্বর কণ্ঠের নয়, হৃদয়ের।

হঠাৎ বোধ হয় আমার কথা মনে পড়ল, বললেন, "নির্জনতার স্তুতি-স্তোত্র আবৃত্তি করছিলেম, মিলা রেপার রচনা। অপূর্ব। অনেকগুলি শ্লোকের সুরু এই রকমের: অনুবাদকশ্রেষ্ঠ মারপা, তোমার পায়ে প্রণাম করি, তুমি আমায় বল দাও আমার নিভৃত পর্বতকন্দরে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমাহিত হয়ে

থাকবার। পর্বতের নিভৃতির প্রয়োজন এইখানেই। অপরিহার্য নয়, কিন্তু সহায়ক।”

যে মাধ্যাকর্ষণ আমাকে বেঁধে রেখেছে মাটির সঙ্গে তার বন্ধন কিয়ৎপরিমাণে শিথিল বলে মনে হোলো কিনা জানিনে, কিন্তু দূরের পাহাড়কে অত দূর যেন মনে হোলো না। আমার মুখের ভাবে তার প্রকাশ ছিল কি না জানিনে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক বললেন, “কী, যাবেন নাকি আমার সঙ্গে ?”

এমন প্রশ্নের সহজ উত্তর ‘না’। সেই উত্তরই আমার দেবার কথা মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে। কিন্তু কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারলেম না যেন। তিন দিন পরে আমার ছুটি ফুরোবে এবং সোমবার আমাকে আপিসে হাজির হতে হবে, এমনি কোনো নির্বোধ কথা কিছুতেই মুখে আনতে পারলেম না। বস্তুত, কিছুই বলতে পারলেম না। উত্তর এড়িয়ে সজল নয়নে তাকিয়ে রইলেম হিমালয়ের দিকে।

আমার নিরুত্তরতার অর্থ স্পষ্ট। বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই, কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক বললেন, “অবিশ্যি না গেলে আক্ষেপের কিছু নেই। আগেই বলেছি তো, স্বয়ং মারপাও বানপ্রস্থে যাননি।”

মারপার সঙ্গে আমার এই সাদৃশ্যে সান্ত্বনা ছিল অল্পই! অনেক তো দেখলেম, কোনো কিছুই তো ভালো লাগল না। আনন্দের সন্ধান পেলেম না কোথাও। তবু কেন পারিনে সব ছেড়ে দিয়ে সব পাওয়ার শেষ চেষ্টায় ঝাঁপ দিতে ? হারাব যা তা তো চাইনে, তবু কেন হারাতে এত দ্বিধা, এত ভয় ?

বন্দীদশার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ করে শেষে দরজা যখন খুলল তখন কেন পারিনে ছুটে বেরিয়ে পড়তে ?

কেন জানিনে, কিন্তু পারিনে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে হিমালয় যাত্রার অভিলাষ আমার আসক্তির চাইতে প্রবল নয়। তাই চুপ করে ছিলেম। কিন্তু বোধ হয় এই অপূরণীয়তারই জন্যে, অসাধ্য সাধ মনের মধ্যে কেবলি আলোড়িত হচ্ছিল।

পর্বতের সঙ্গে মানুষের আধ্যাত্মিকতার কোথায় যেন অচ্ছেদ্য যোগ আছে। গ্রীক দেবতারা আর কোথাও থাকেননি, বাসা বেঁধেছিলেন অলিম্পাস পাহাড়ে। আমাদের হর-পার্ব্বতী অরণ্যে থাকেননি, হিমালয়ে। দশ আদেশ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে উচ্চারিত হয়নি, সিনাই পর্বত থেকে ঘোষিত হয়েছে। পাহাড়ের পায়ের তলায় দার্জিলিঙে এসে এই কথা বারবার মনে পড়ে।

তবু পারিনে।

অন্যান্য মায়ার কথা বাদ দিলেও, তর্কলোভী মনে 'পলায়ন' কথাটা বার বার এসে বিরক্ত করতে থাকে। যদি ধরেও নিই যে পাহাড়ের গুহায় পালিয়ে গিয়ে আমি নিজে বাঁচতে পারব, আর সকলের হবে কী? সবাই তো আর পাহাড়ে যেতে পারবে না। আর যদি যায়ও, তাহোলে তো সেখানে আবার গড়ে উঠবে কলকাতা আর লণ্ডন, বোম্বাই আর নিউ ইয়র্কের নব সংস্করণ। তার মানেই তো আবার যুদ্ধ, আবার শোষণ, আবার পীড়ন, আবার অশান্তি। তখন কি ধ্যান করতে নেমে আসব শ্যামবাজারে আর ক্যামডেনে ?

আমার সন্দেহের কথা জানাতে ভদ্রলোক বললেন, "আমি কোনো কিছু পড়িনি অনেক দিন, এমন কি খবরের কাগজও নয়। তাই ভালো করে জানিনে আপনাদের সমস্যার কথা। এইটুকু জানি যে, তাদের সমাধান নেই সমষ্টিগত প্রচেষ্টায়। তাতে পীড়ক-পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু পীড়ন শেষ হবে না। শোষক পরিবর্তন হতে পারে, শোষণ শেষ হবে না। যুদ্ধে এক দল না জিতে অপর দল জয়লাভ করতে পারে, যুদ্ধ বন্ধ হবে না। সামাজিক সমস্যার কোনো সামাজিক সমাধান নেই। এটা সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপেরই মত। বিস্তারের আগে ব্যাধির নিবারণের সামাজিক ব্যবস্থা যদি বা সম্ভব, রোগ একবার ছড়িয়ে পড়লে প্রত্যেক রোগীকে আলাদা আলাদা ভাবেই চিকিৎসা করতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তি তার আপন চেষ্টায় সুস্থ হলে তবেই সমাজ সুস্থ হবে, তার আগে নয়।"

"সে তো সহস্র যুগের কথা!" আমার নৈরাশ্য স্বরে প্রতিফলিত হোলো।

"কিন্তু উপায় কী? সময় বাঁচাতে গেলে রোগী বাঁচানো যাবে না।" আমার অধৈর্যে তিনি আদৌ বিচলিত হলেন না। "যোগ অংকে তো যাদু নেই! পৃথকভাবে যারা ব্যাধিগ্রস্ত, এক সঙ্গে থাকলেই কি তারা সুস্থ হয়ে উঠবে?"

আমার হতাশা গোপন না করে বললেম, "সময়ের কথা ছাড়াও ব্যক্তির চিকিৎসা নিয়েও যে আবার নানা মুনির নানা মত।"

"সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষ্য করে থাকবেন, আপনার

সঙ্গে এত কথা বললেম, একবারও ঈশ্বরের উল্লেখ করিনি। ঈশ্বর আছে কি নেই, তা নিয়ে গবেষণা করতে ভগবান বুদ্ধ কখনো উৎসাহ দেননি। তাই বৌদ্ধধর্ম নাস্তিক কি না, তা নিয়ে তর্কের শেষ নেই। জ্ঞান লাভ করে দুঃখ জয়ের পথের ইঙ্গিত করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন। অষ্ট পথের সন্ধান দিয়েই ছুটি নিয়েছিলেন। মানুষের পক্ষে তাই যথেষ্ট বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাই আপনার মতো যারা সমাজের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেন, তাদের পক্ষে সেই অষ্টপথের কথা বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। আপনি যে ব্যক্তির চিকিৎসার কথা বলছিলেন, হয়তো এরই মধ্যে তার উত্তর আছে।"

আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলেম।

"লামা ছাড়া এ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার অধিকার কারে নেই। তবু আমি যেটুকু জানি, তাই আপনাকে বলতে চেষ্টা করছি। আটটি পথ হচ্ছে সদিচ্ছা, সৎ মত, শুদ্ধ বাক্য, শুদ্ধ কর্ম, শুদ্ধ জীবন, শুদ্ধ চেষ্টা, পূর্ণ জ্ঞান আর ধ্যান। এর ব্যাখ্যা করবার বিদ্যা নেই আমার। কিন্তু এর বাইরে আর কিছু থাকতে পারে বলে জানিনে।"

তালিকাটি সত্যি অসম্পূর্ণ নয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে স্বল্প-সংখ্যক কয়েক জন যদি এভাবে জীবন যাপন করেন তাদের চেষ্টা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে না বহুর উদ্ধত এবং বিপরীত অপচেষ্টায়? আর সেই স্বল্পসংখ্যক কয়েকজনের বাইরে আর কে-ই বা তা থেকে উপকৃত হবে কী ভাবে? অথচ মারপা, মিলা রেপাকে যখন ধ্যানের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তাঁকে বলে-

ছিলেন, 'তোমার বাকী জীবন শুধু ধ্যান করবে যা থেকে সমগ্র প্রাণী-জগতের কল্যাণ সাধিত হবে।' কী করে ?

"অষ্ট পথে সিদ্ধ যে পুরুষ—যাকে বোধিসৎ বলা হয়—তিনি আর একা নন, তাঁর দুঃখ তাঁর একার নয়, তাঁর আনন্দ তাঁর একার নয়, তাঁর উপলব্ধি তাঁর একার নয়। তাছাড়া আমরা কোনো কর্মকেই পূরোপূরি নিষ্ফলা বলে মনে করিনে। সৎকর্ম—তা সে যত সামান্যই হোক—তার সুফল চতুর্দিকে বিকিরণ করতে বাধ্য। অসৎ কর্ম সম্বন্ধেও সেই কথা।—তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক।"

"যে ফলের কথা বললেন, তা আর যাই হোক, সব সময় প্রত্যক্ষ নয়।"

"সব সময় হয়তো নয়, অন্তত আপাতত। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, একটি মাত্র ব্যক্তির সৎ কর্মে এমন কি সৎ চিন্তায়—সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ হতে পারে। এখনো, এ-যুগেও যে হতে পারে, মাত্র অল্প কিছুদিন পূর্বেও এদেশেই তা আবার প্রমাণিত হয়ে গেছে। ভালো মন্দ কোনো চিন্তা, কোনো কথা, কোন কাজই নিরর্থক নয়। এমন কি তার ফলও শুধু মাত্র কর্তাতেই বর্তে না। তার প্রতি কণা প্রতিভাত, প্রতিধ্বনিত, প্রতিফলিত হয় পৃথিবীর দূরতম কোণে। পৃথিবীর প্রতি পুণ্যে অংশ আছে প্রতি প্রাণীর, পৃথিবীর প্রতি কলঙ্কে দায়িত্ব আছে প্রতি প্রাণীর।"

উদাহরণ স্বরূপ ভদ্রলোক কার কথা বলছিলেন তা বুঝতে কষ্ট হয়নি। তাই উত্তর খুঁজে পেলেম না। চুপ করে রইলেম।

তিনি আবার চোখ মুদে অস্ফুট শব্দে কী যেন মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। আমি যেন তাঁর পাশে নেই। মুখে তাঁর নির্ভুল আনন্দের সুস্পষ্টতম প্রতিচ্ছবি। আমি বিদায় নিলেম না। ডাকলেও বোধ হয় শুনতে পেতেন না। আমি নিঃশব্দে চলে এলেম।

ফিরবার পথে রাস্তার মোড়ের একটা রেডিয়োতে শুনলেম যে মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন।

বারো

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম···"

বিরাম নেই আর। সকাল থেকে পাশের বাড়ির রেডিয়োতে অবিশ্রাম বেজে চলেছে। তার মাঝে মাঝে হচ্ছে ইংরেজি ও হিন্দীতে ধারা-বিবরণী। মহাত্মা গান্ধীর শববাহী শোকযাত্রা অগ্রসর হচ্ছে রাজঘাটের দিকে। ইণ্ডিয়া গেট না কী গেট যেন পার হয়ে গেছে। পৌঁছোতে আর বেশি বাকী নেই।

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম···"

এদিকে আমার ভৃত্য জানিয়ে গেছে যে ক্লাবসাইড মোটরসের সঙ্গে বন্দোবস্ত পাকা করা হয়েছে। ট্যাক্সি আসবে ঠিক সময়ে। শিলিগুড়ি থেকে ক্যালকাটা মেলে বার্থ রিজার্ভ করা হয়েছে। কিছু অসুবিধা হবে না। সব ঠিক।

সব ঠিক। আজ রওনা হলে কাল সকালে কলকাতা পৌঁছতে পারব। তার পরে এক দিনের বিশ্রাম নিয়ে পরশু সকালে, দোসরা ফেব্রুয়ারী, আপিস করতে কষ্ট হবে না। শৈলশিখরে ছুটি কাটিয়ে নূতন উদ্যম নিয়ে আবার নিজেকে নিয়োজিত করতে পারব আত্মোন্নতির নির্ধারিত পথক্রমণে। সব ঠিক। কিন্তু—

"···পতিত পাবন সীতারাম।"

সব ঠিক। কিন্তু কী যেন নেই। দূরে ওই হিমালয় ঠিক

দাঁড়িয়ে আছে। আমার সামনের চেয়ারটা যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই আছে। এতটুকু নড়েনি। উপরে সূর্য কিরণ বিকিরণ করছে। সব ঠিক আছে।

কিন্তু কী যেন নেই!

আমার ডান হাতে ঠিক পাঁচটা আঙুলই আছে, বাঁ হাতেও তাই! হাত এবং পা দুটো করেই আছে।' চোখ এবং কানও দুটো। মাথাও একটা, যেমন আগে ছিল। সব কিছু ঠিক আছে, যেমন কাল ছিল। কিন্তু তবু, কী যেন নেই।

কোথা থেকে কী যেন চলে গিয়েছে।

যা গেছে, তা আমার সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল না। তা যখন ছিল, তখন জানিনি যে সে ছিল। কিন্তু তবু, এখন জানি যে সে নেই। কী হৃত হয়েছে জানিনে। কিন্তু রিক্ত যে হয়েছি, তার ব্যথা অনুভব করছি সর্ব অঙ্গ ব্যেপে। সর্বাঙ্গীণ সত্তায় সঞ্চারিত হয়েছে সব হারানোর সম্পূর্ণ অসহায়তা!

আকাশে সূর্য নেই। চন্দ্র নেই। খেদ করিনে। কিন্তু তারা গেল কোথায়? ধ্রুবতারা? দিক্‌নির্দেশের জন্যে সেই ধ্রুবতারার দিকে তাকাইনি এর আগে ; সাধিয়া মরেছি ইহারে উহারে, তাহারে। কিন্তু তবু, আজ কেন মনে হচ্ছে পথ হারিয়েছি? কেন কেঁদে মরছি শিশুর মতো? অপরাধীর মতো?

"...সবকো সন্মতি দে ভগবান।"

সকাল থেকে সহস্রবার হাত ধুয়েছি কাল রাত্রের হিম শীতল জলে। তবু কেবলি যেন মনে হচ্ছে, রক্তের দাগ যেন রয়ে গেছে হাতের মাঝখানে। সে দাগ যেন মুছবার নয় কলের

জলে। একটা গোটা সমুদ্রের জলেও যেন মুছবে না সেই রক্তের দাগ। সে-রক্ত হিংস্রতায় লাল, অপরাধে কালো। লাল গেলেও কালো যেন লেগেই আছে। সে যেন যাবার নয়।

হাত ধুয়ে চলেছি তবু। কলের জলে। চোখের জলে। কিন্তু মোছে কই দাগ? ঘোচে কই দুঃখ?

…"রঘুপতি রাঘব রাজারাম"

এ বাড়ির বেয়ারাটা রোজ সকালে চা দেবার সময় আমাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়। আমি চোখ খুললেই হেসে সুপ্রভাত জানায় হাসির ভাষায়। আজ যখন চোখ খুললেম, তখন তার মুখে হাসির আভাসমাত্র ছিল না। ছায়া ছিল কোন বিষাদের।

জিজ্ঞাসা করলে ও নিজেও বলতে পারতো না কেন এই বিষাদ। ও তাঁকে দেখেনি কখনো, নাম শুনেছে কারো কাছে বা। কখনো বা অপরের হাতের খবরের কাগজে দেখেছে ছবি। এমন ছবি তো দেখেছে আরো কত জনের, নাম শুনেছে কত ছায়া-চিত্রাভিনেতার।

ও জানে না কেন তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। জানে না কেন তাঁর ছবি ছাপা হয়েছিল কাগজে। জানে না কেন তিনি বেঁচেছিলেন। বা কেন এই মুহূর্তে তিনি বেঁচে নেই। তাঁর বাণীর কোনো কণা বা আদর্শের কোনো ইঙ্গিত পৌঁছায়নি এই বালভৃত্য ভুটিয়ার প্রাণে বা কানে। তবু ওর চোখে কেন জল?

…"জয় রঘুনন্দন জয় সীতারাম"

আমি আবার স্নানের ঘরে প্রবেশ করলেম হাত ধুতে। জানি ধুয়ে লাভ নেই। তবু।

…"পতিত পাবন সীতারাম।"

হঠাৎ দরজায় আঘাত শুনতে পেলেম। চমকে উঠলেম। কে এলো? ধরা পড়ে গেলেম নাকি? তা আবার রক্তাক্ত হস্তে? এখন? পালাবো কী করে? লুকোবোই বা কেমন করে? এখন?

ভীত কণ্ঠে বললেম, "কে?" বাইরে থেকে শোনা গেল না বোধ হয়।

বেয়ারাটার পরিচিত কণ্ঠও ফৌজদারী আদালতের বাদী কৌঁসুলীর জেরার মতো শোনালো। আমি যেন আসামী।

হাত থেকে সাবানটা নামিয়ে রেখে আবার বললেম, "কে?"

"একটি ছোটো ছেলে অনেকক্ষণ থেকে এসে বসে আছে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। আরো বসতে বলব?"

"হ্যাঁ, বসতে বলো। আমি এখনি আসছি।"

আমার সেই 'এখনি' কতক্ষণ হোলো জানিনে। সময়ের পরিমাপের কথা মনে ছিল না। ভীরু পদক্ষেপে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার ঘরে কাউকে দেখতে পেলেম না। আরেকটু এগিয়ে এসে দেখি একেবারে বাইরের দরজার কাছে নীরবে নতনেত্রে মোহন দাঁড়িয়ে আছে।

মোহন কাঁদছে।

আমাকে দেখতে পায়নি তখনো। দরজার গায়ে হেলান

দিয়ে হাত রেখে তার উপর মাথা দিয়ে কেবলি কাঁদছিল মোহন। চোখের জলে দৃষ্টি বুঝি হয়েছিল রুদ্ধ। তাই বুঝি দেখতে পায়নি আমাকে। তাই বুঝি কাঁদছিল বিনা লজ্জায়।

একেবারে শিশু যে, কান্নাই তার ভাষা। সে কাঁদে সহজেই। লজ্জিত হয় না। অপর পক্ষে, যাকে জীবনের অনেক কিছু দেখতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে, সে জানে যে কান্না ছাড়া উপায় নেই বেশির ভাগ সময়েই। আরো জানে যে কান্না গোপন করায় নিহিত নেই কোনো অলৌকিক গৌরব।

কিন্তু এই দু'য়ের মাঝের দিনগুলিতে লজ্জাবোধ থাকে বড়ো প্রখর। চোখের জল ফেলাকে তখন মনে হয় শোচনীয় কাপুরুষতা। তখন অশ্রুবিসর্জনের চাইতে প্রাণ-বিসর্জনও যেন সহস্রগুণে সহজ!

মোহনের বয়সটা এখন সেই জায়গায়। কাঁদতে তার অসীম লজ্জা। পাছে কেউ মনে করে বসে সে ছেলেমানুষ রয়ে গেছে, বড়ো হয়নি। ছি, ছি!

কিন্তু মোহন আমায় দেখতে পায়নি। জানতোই না যে আর কেউ আছে তার কাছাকাছি। তাই সে মাথা নীচু করে কাঁদছিল কল্পিত নিভৃতে। দু'হাত দিয়ে চোখের জল মুছছিল নিমেষে নিমেষে। চোখের জল যেন ফুরোয় না আর।

মোহনকে প্রথম যেদিন দেখেছিলেম, সেদিন সে বলেছিল তার একাধিক আত্মীয় বিয়োগের কথা। পিসী, কাকা, আরো কে-কে যেন নিহত হয়েছিল পাঞ্জাবের পাশবিক দাঙ্গায়। তাদের কথা বলতে বলতে মোহন কেঁদে ফেলেছিল। সে তার

পিসীর কোলে ঘুমিয়েছে অনেকগুলি রাত্রি, কাকার সঙ্গে বেড়াতে গেছে অসংখ্য বিকেল, ভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছে অনেক চকোলেট, বোনের সঙ্গে খেলেছে সারা শৈশব। তাদের মৃত্যুতে মোহন কাঁদবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। না কাঁদলেই অস্বাভাবিক হোতো।

মৃত্যু কী মোহন না জানতে পারে। কিন্তু এটুকু সে তার শিশু মনে বুঝতে পারে যে, পিসী-কাকা-ভাই-বোনের মৃত্যু মানে পিসী আর তাকে ঘুম পাড়াবে না, কাকা নিয়ে যাবে না বেড়াতে, ভাই দেবে না চকোলেট, বোন আর আসবে না খেলতে। সে সেখানে জানে কী গেছে, কী আর আসবে না। কাঁদবে বৈকি !

কিন্তু আজ? আজকের কান্না কেন ছাপিয়ে উঠেছে সেদিনের কান্নাকে? কেন বাধা মানছে না আজকের অশ্রু? কে আর চকোলেট দেবে না? কে নিয়ে যাবে না বেড়াতে?

তেমন কেউ নয়। তবে কেন চোখ ব্যথা হোলো কেঁদে? হাত ব্যথা হোলো চোখ মুছে?

হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে মোহন ফিরে পেল তার বয়সোচিত লজ্জাবোধ। ব্যস্ত হয়ে চোখ মুছলো মুখ লুকিয়ে। হাসতে চেষ্টা করল একটু আমার দিকে মুখ তুলে। ক্রন্দনও এর চাইতে করুণতর হতে পারতো না।

আমি শিশু নই, কিন্তু কিশোরও নই। অশ্রু গোপন করে দুঃসাহসিকতা প্রমাণ করবার দায় নেই আমার। আমি

স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেম আমার ঘরের দরজার পাশে। দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে ছিলেম মোহনের দিকে।

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মোহন আর পারলে না অশ্রুরোধ করতে। কিছু না বলে ছুটে চলে গেল রাস্তার দিকে।

আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিল অনেকক্ষণ। কিছু বলবে বলে এসেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু একটি মাত্র কথা না বলে পালিয়ে গেল। রেখে গেল শুধু চোখের জল।

যেন আমার নিজের ছিল তার অভাব!

আমি মোহনকে ডাকলেম না। জানতে চাইলেম না ইচ্ছা-পূরণে কেন সে হয়েছে এমন শোকাচ্ছন্ন।

কতক্ষণ প্রস্তর-মূর্তির মতো স্থির হয়ে দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে-ছিলেম জানিনে। আসলে স্থির হয়ে নয়, অস্থির হয়ে, যদিও স্থাণু হয়ে।

হঠাৎ চমকে উঠলেম ভৃত্যের আবির্ভাবে। বলল, কী কী বাঁধবে আর কোন জিনিষ কোন বাক্সে রাখবে, যদি একবার দেখিয়ে দিই। হাতে আর খুব বেশি সময় নেই কি না।

সময় নেই? কিসের? ও হ্যাঁ। আমার আজ দার্জিলিং ছেড়ে কলকাতা ফিরে যাবার কথা যে। ছুটি যে ফুরিয়েছে। আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক। অর্থাৎ আপিস। ভগবান!

কিন্তু তার পরের লাইনগুলি কী? হ্যাঁ, মনে আছে, 'আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক। মোর পাত্র

রিক্ত হয় নাই।' কিন্তু আমার? আমার পাত্র শুধু তো রিক্ত হয়নি, পাত্রখানি চূর্ণ হয়েছে।

তার পরের লাইনটা? 'শূণ্যেরে করিব পূর্ণ এই ব্রত বহিব সদাই।' আমার পাত্রই যে সহস্র খণ্ডে বিচূর্ণ হয়েছে, ভাঙাচোরা টুকরোগুলি এদিকে ওদিকে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে জঞ্জালের মতো। যেগুলি সব মিলিয়ে ছিল সুন্দর একটি পাত্র, যা তার মধ্যে ধারণ করতে পারতো স্বর্গের সুধা, সেগুলি এখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে অট্টহাস্য করছে আমার জীবনের উপর। যার পাত্রই নেই, সে পূর্ণ করবে কী!

ও হ্যাঁ, কিন্তু বাক্সগুলি ভর্তি করতেই হবে। ভৃত্য আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছে। ট্যাক্সি আসবে তিনটেয়। তার আগে সেরে নিতে হবে অনেক কাজ। কিনে নিতে হবে, যা কিছু আছে দার্জিলিং থেকে কুড়িয়ে নেবার। একবার দেখা করে যেতে হবে মিসেস্ রায়ের সঙ্গে, ধন্যবাদ জানাবার জন্যে। শিখা বোধ হয় আর দার্জিলিঙে নেই, ভালোই হয়েছে।

একবার দেখা করতে হবে সেই নেপালী ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আসতে হবে তাঁর তিব্বতযাত্রারসাফল্য কামনা করে। আর তাঁকে জানিয়ে আসতে হবে তাঁর নিমন্ত্রণের অগ্রহণ, হতে পারব না তাঁর তিব্বত অভিযানের সাথী। সকল হতাশা, সকল অপমান, সকল অবহেলা সত্ত্বেও এই ভালো-মন্দে মেশানো পৃথিবীর প্রবল আকর্ষণ জয় করতে পারব না। আজো নয়। তাঁকে জানাতে হবে এ-কথা। জানাতে হবে আরো দু'য়েকটা কথা। কাল তিনি বলছিলেন

যে, পৃথিবীতে ক্ষুদ্রতম শুভকর্মও ব্যর্থ হতে পারে না। হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা চাইই।

অনেক কাজ। সময় অল্প। বেরিয়ে পড়লেম পথে।

পা দুটো যেন চলতে চায় না। উঁচু-নীচু যে পথ গত পনেরটা দিন অবলীলাক্রমে পরম আগ্রহভরে আনন্দের সঙ্গে এতবার অতিক্রম করেছি, আজ যেন সেই দয়াহীন পথ অসংখ্য উপলখণ্ডে আকীর্ণ হয়ে দুর্গম হয়েছে। চলতে পারিনে আর।

অপরিসীম অশান্তির বোঝা কাঁধে করে দার্জিলিঙে এসেছিলেম। জায়গাটাকে ভাল লেগেছিল প্রাণ ভরে। আজ ফিরে যেতে হবে। যাবার আগে দার্জিলিঙের সকল আকর্ষণ এমন নিঃশেষে মুছে যাবে, কল্পনাও করিনি। আজ দূরের ওই আকাশকে মনে হচ্ছে ঊষর মরু বলে, ওই হিমালয়কে মনে হচ্ছে পৃথিবীর পিঠে কুৎসিৎ কুব্জের মতো। সব কিছুকে মনে হচ্ছে কুৎসিৎ, নয়তো অর্থহীন। সব কিছু যেন এলোমেলো হয়ে গেছে।

কিছু দূর যেতে দেখা হয়ে গেল 'কাঞ্চনজংঘা কর্ণারের' বেয়ারার সঙ্গে। সে আসছিল আমারই দিকে। আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, "ভালোই হোলো।" পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে বলল, "আমাদের ঠিকানায় এই চিঠিটা এসেছে আপনার নামে। এই জন্যেই আপনার ওদিকে যাচ্ছিলেম।"

আমি চিঠিটা নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেম মিসেস রায়ের কুশল। বেয়ারা বলল, "ভালো নেই। কাল

থেকে কী যেন হয়েছে। আজ ভোরে উঠে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। চাকরকে বলেছেন ফালুতে যাবেন। ঠাকুরকে বলেছেন, ফাঁড়িতে যাবেন। কী নাকি দরকার আছে। বুঝতে পারছিনে কিছু। সাহেব মরে যাবার পর থেকেই কেবল কাঁদতেন, আর কিছু করতেন না। কিন্তু কাল থেকে যেন বেড়েছে। পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে পড়লেন। আর আপন মনে কী বলতে থাকলেন। একবার বলেন ডাক্তার ডাকতে, আরেকবার বলেন পুলিশ ডাকতে। বলেন, পুলিশের সঙ্গে কী জরুরী কথা আছে, যা আজ না বললেই নয়। কিছুই বুঝতে পারছিনে।”

“তাইতো!” আমি কিছু শুনছিলেম, কিছু শুনছিলেম না, কিছুই বুঝছিলেম না। আর কিছু খুঁজে না পেয়ে বললেম, “কাল কখন থেকে এ রকম হোলো?”

“এই তো বিকেল থেকে। রেডিয়ো শুনছিলেন একা বসে। হঠাৎ রেডিয়োর গান থেমে গেল। তার পর কী যেন বলল ইংরেজীতে। আর অমনি মেমসাহেব চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন। আর তার পর থেকে সারা রাত কেবল বলেছেন, ‘পুলিশ ডাকো, আমার অনেক কথা আছে পুলিশের সঙ্গে। শিগগির পুলিশ ডাকো, আর সময় নেই।’ আমরা কিছুই বুঝলেম না।”

আমার সময় ছিল না। আমি বললেম, “মেম সাহেব ফিরে এলে বোলো আমি আজ চলে যাচ্ছি।” বখশিস দিয়ে বিদায় করতে চাইলেম বেয়ারাকে। সে কিন্তু চলতে থাকল আমার সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরে বলল, "আচ্ছা, গান্ধী লামা কি হিন্দু ছিলেন না বৌদ্ধ ?"

আমি বললেম, "হিন্দু"।

"উঁহু, নিশ্চয় বৌদ্ধ। উনি বুদ্ধ।" বেয়ারা বলল একান্ত নিশ্চিত নিঃসন্দেহ কণ্ঠে। "বৌদ্ধ ছাড়া এমন হবেন কী করে ?"

তৎক্ষণাৎ এমনি গভীর প্রত্যয়পূর্ণ আরো অনেকগুলি উক্তি ভেসে এলো আমার কানে :

"না, উনি নিশ্চয় খৃষ্টান। উনিই খৃষ্ট। তা নইলে এমন হবেন কী করে ?"

"না উনি নিশ্চয় মুসলমান। উনিই পয়গম্বর, তা নইলে এমন হবেন কী করে ?"

"উহু, উনি নিশ্চয়..."

উনি সত্যি কী ছিলেন তা নিশ্চয় করে বলতে পারিনে। কোনো বিশেষ ধর্মে দেবত্বের মনোপলি আছে বলে আমি জানিনে। তাই চুপ করে রইলেম বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী দাবীর সম্মিলিত ঘোষণে।

আমাকে নিরুত্তর দেখে বেয়ারা আবার বলল, "উনি নিশ্চয় বৌদ্ধ ছিলেন।"

"তুই কী করে জানলি ?"

"আমি জানি।" আর কিছু বলবার ভাষা পেল না নিরক্ষর ভুটিয়া বেয়ারা। সে জানে গান্ধীজী ওর আত্মীয় ছিলেন, স্বধর্মী ছিলেন, আপন জন ছিলেন। আর কিছু জানে না, কী করে জানে তাও জানে না ; কিন্তু জানে, নিশ্চয় করে জানে।

আমি বললেম, "দেখেছিস কখনো তাঁকে ?"

"না।"

"তবে ?"

"বা রে, ভগবানকেও তো দেখিনি, তাই বলে কি তিনি নেই ?"

এর পরে প্রশ্ন চলে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে দেখেছি নানা প্রত্যক্ষ প্রাণীর সাক্ষ্য দিয়ে। কিন্তু একজন ঐতিহাসিক অস্তিত্ববান, সমসাময়িক পুরুষের কথা প্রমাণ করবার জন্যে ঈশ্বরের সাক্ষ্য দেওয়া, এমন আর শুনিনি এর আগে। অশিক্ষিত ভুটিয়া বেয়ারা, তার যুক্তি-চাতুর্য এর চেয়ে বেশি আর হবে কি করে!

আমি চোখ নীচু করে পথ চলছিলেম। বেয়ারা কখন নিঃশব্দে আমার সঙ্গ পরিহার করে চলে গেছে জানতেম না। কোনো বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না জানবার। আমি এগিয়ে চলছিলেম ধীরে, আপন মনে।

দু'দিকের দোকানগুলি বন্ধ। সন্ধ্যা সমাগমে সূর্য অস্ত গেলে সূর্যমুখীর সারি যেন চোখ মুদেছে কিছু লাজে, কিছু ভয়ে, কিছু অভিমানে। শীতের দার্জিলিঙে এটা তেমন অস্বাভাবিক নয়। এই সময়টায় পথ এমনিতেই সাধারণত জনহীন থাকে। কিন্তু তবু কী যেন প্রভেদ আছে। নিদ্রিতের সঙ্গে মৃতের যে-প্রভেদ।

আর সব দোকানের মতো প্লিভাও বন্ধ। দরজার সামনে-রয়েছে বড়ো একটা মাল্য-ভূষিত আলোকচিত্র, মহাত্মা গান্ধীর।

যিনি সারা জীবন আন্দোলন করেছেন প্লিভার প্রধান ব্যবসায়ের প্রধানতম পণ্যের বিক্রয়ের বিরুদ্ধে। এর চেয়ে বড়ো অসঙ্গতি আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আজ একে শঠ কপটতা বলে মনে হোলো না একবারও।

দোকানটার সামনে মাইলস্টোনের মতো একটা পাথরের টুকরো আছে। আমি তারই উপর কোনোক্রমে একটু বসলেম। বিশ্রামের জন্যে, কিন্তু কেবল মাত্র বিশ্রামের জন্যেও নয়। আমার পকেটের ভিতরকার না-খোলা চিঠিটা গলা-টিপে-রাখা মানুষের মতো আর্তনাদ করছিল।

খামের উপরের ঠিকানার হস্তাক্ষর একান্ত পরিচিত। এ চিঠি তারই লেখা, যার অবহেলা এমন গভীর হয়ে মনে না বাজলে আমার দার্জিলিঙে আসাই হতো না। অজানা থাকতো জীবনের নিবিড়তম আনন্দ, অজানা থাকতো জীবনের কঠিনতম নৈরাশ্য আর গভীরতম বেদনা।

ভয়ে ভয়ে খুললেম চিঠিটা। কী জানি আরো কোন আঘাত সঞ্চিত রয়েছে ওইটুকু ওই ক্ষুদ্র খামের মধ্যে। অল্প কিছু দিন মাত্র আগে ওই হাতের লেখা চিঠি খুলতে আশার ঢেউয়ে বুক হয়ে উঠতো উত্তাল। আজ আর আশা করতেই সাহস পাইনে কোনো কিছু থেকে। খুললেম চিঠিটা।

সে ফিরে যেতে লিখেছে।

বিশ্বাস করতে পারছিলেম না। আবার পড়লেম চিঠিটা। আবার। আবার। হ্যাঁ, সত্যি সে ফিরে যেতে লিখেছে। সত্যি।

আর কিছু চাইনে। কিছু না। খ্যাতি চাইনে, বিত্ত চাইনে,

জন্মচক্র থেকে মুক্তি চাইনে, মোক্ষ চাইনে—শুধু যদি তোমার কাছে যাবার নিমন্ত্রন পাই, অনুমতি পাই তোমার কাছে থাকবার। শুধু যদি এই কথাটি জানতে পাই যে আমার সকল ত্রুটি, সকল অক্ষমতার ক্ষমা আছে তোমার কাছে। শুধু যদি জানি যে তোমার হৃদয় থেকে আমার ঘটেনি চির-নির্বাসন। শুধু যদি বলো যে, আমাকে রাখবে তোমার কাছে—তাহোলে হেলাভরে বিসর্জন দিতে পারি সমগ্র বিশ্বকে, হেলা করতে পারি সমগ্র বিশ্ব-সমাজকে, উপেক্ষা করতে পারি সকল অপবাদ, উদাসীন থাকতে পারি আর সব কিছুর যত কিছু অসঙ্গতি, তার সব কিছুর প্রতি। আর তো কিছু চাইনে। শুধু তোমার হতে চাই। নিজেকে শুধু সমর্পণ করে দিতে চাই তোমার ওই কোমল বাহুর নিঃসীম প্রশান্তির নিশ্চিত নির্ভরতায়। কোনো প্রশ্ন করব না জীবনের কাছে, উত্তর চাইব না মৃত্যুর কাছে। আমার হাতে নাই ভুবনের ভার। একবার শুধু বলো আমাকে ফিরে যেতে। কোনো প্রশ্ন থাকবে না আর, থাকবে না কোনো দুঃখ।

দুঃখ?

কীট্‌সের সেই forlorn কথাটার মতো এই দু'অক্ষরের কথাটা কর্কশ ঘণ্টাধ্বনির মতো আমাকে নির্দয়ভাবে টেনে আনল স্বপ্ন থেকে। আর অমনি সহস্র প্রশ্ন লক্ষ সন্দেহ আমাকে ঘিরে ধরল পলাতকের মতো!

দুঃখ হচ্ছে সৃষ্টির গোড়ার কথা। আর সব অস্বীকার করা চলে, উপেক্ষা করা চলে ; কিন্তু দুঃখকে না মেনে উপায় নেই।

সে দুঃখ তো শুধু হারানোর দুঃখ নয়, পাওয়ার দুঃখ। যা না পাওয়ার দুঃখে দার্জিলিঙে এসেছিলেম স্বেচ্ছানির্বাসনে, আজ তাই পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে, মুহূর্তমাত্র পূর্বে, মন ভরে উঠল আনন্দে!

কিন্তু তার পর? বাসনা কি এমনি প্রবল থাকবে কলকাতায় নামবার পরেও? পাবার পরেও?

কী জানি! যে দোকানের সামনে বসেছিলেম, তার পণ্যের মতো একান্তই ক্ষণিক এর উত্তেজনা। তখনকার মতো, চাহিয়া দেখি রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি। কিন্তু শুধু তখনকারই মতো। যেই মাত্র তারে নিকটে আনি টানি, রাখিতে চাহি বাঁধিতে চাহি তারে; অমনি আঁধারে সে যে মিলায় বারে বারে। দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টির মধ্যে তখন যা অবশিষ্ট থাকে তা আর যাই হোক, যা চেয়েছিলেম তা নয়, তা নয়। আজ যে বাহু-বন্ধনে সব-চাওয়া, সব পাওয়া জলাঞ্জলি দিয়ে মনে হবে সব হারিয়ে সব পেলেম, কাল সে বাহুবন্ধন শিথিল হবে। নয়তো আমারই কাছে সেই বাহুডোর শৃঙ্খলের মতো অসহনীয় হয়ে উঠবে।

তারপর? তখন কী বাকী রইবে? তখনকার নৈরাশ্য যে হবে আজকের হতাশার চেয়েও গভীর! সে দিনের অবসাদ যে হবে আজকের অবহেলার চেয়েও অসহনীয়।

তখন কোথায় যাবো কী চাইতে!

আমি আবার পথ চলতে থাকলেম। কিন্তু কয়েকটিমাত্র মুহূর্ত পূর্বে প্রতীক্ষিত পত্রে যে আকাঙ্ক্ষিত আমন্ত্রণ পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেম, সে উচ্ছ্বাস আর অবশিষ্ট রইল না।

নিমেষ মাত্র আগে যা জগতের সকল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান বলে মনে হয়েছিল তাও মিলিয়ে গেল মরীচিকার মতো। সকল দ্বিধা, সকল সন্দেহ, সকল প্রশ্ন আবার অধিকার করে বসল আমার বিক্ষত মনকে।

আবার সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল।

কলকাতা থেকে দার্জিলিঙে পালিয়ে এসেছিলেম গভীর নৈরাশ্য নিয়ে। বিশ্বাসরিক্ত হৃদয়ের শূন্যতার পূরণ করতে চেয়েছিলেম নানা প্রকার সবস্টিট্যুটের সন্ধান করে।

প্রথমে আকর্ষণ করল প্রকৃতি। হিমালয় আর নীলাকাশ আর বনরাজিতে আভাস পেলেম প্রাণের পরিপূর্ণতার, পরিপূর্ণ আনন্দের। কিন্তু সে-আনন্দ রইল কই? যখন হেসেছি তখন হিমালয় আমার সঙ্গে হেসেছে, যখন ভেবেছি তখন কুয়াশা আমার সঙ্গে ভেবেছে, যখন কেঁদেছি তখন আকাশ আমার সঙ্গে কেঁদেছে। এ তো কবির সেই 'নিলাজ কুলটা ভূমি'! এ তো আমার টেবিলের আয়না! এ তো আমারই ছবি দেখায়; যে-ছবি নিয়তই পরিবর্তনশীল, যে-ছবি কেবলই কাঁপে! যা ছিল অস্থির তা যে অস্থিরই রয়ে গেল! কই, প্রকৃতি তো পারল না আমার শূন্যতাকে ভরে দিতে, আমার চিত্তকে অবিচল আনন্দ দিতে, আমার সত্তাকে সার্থক করে দিতে!

তার পরে দেখা হোলো নানা জনের সঙ্গে, মানুষের মধ্যে খুঁজলেম আমার হারানো শান্তির অস্পষ্ট ইঙ্গিত। কাউকে ভালো লাগলো, কাউকে বা লাগল না। কিন্তু তারা তো সারা জীবনকে ভরে দেয় না। একটা সকাল বা একটি সন্ধ্যা মাত্র

তারা সুধায় দিল ভরে, কেউ বা সুধায়ও নয়। কিন্তু আমার যে অনেক দিনের শূন্যতা। তাকে ভরব কী দিয়ে? কাকে দিয়ে?

প্লিভা-কে প্রত্যাখ্যান করলেম সহজেই। বৃদ্ধ নেপালী জাগালো শ্রদ্ধা আর কৌতূহল। তার বেশি নয়। একক সুকৃতির কথা মনের মধ্যে মূল নেবার আগেই এলো কাল বিকেলের খবর, আবার সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল।

তারপর ভুটিয়া বেয়ারা দিয়ে গেল চিঠি। সংক্ষিপ্ত কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেম অনির্বচনীয় আনন্দের অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিতে।

কিন্তু তারপর?

এমন অবসাদমুক্ত আনন্দের সন্ধান পাবো কোথায়, যা আমার নিঃসঙ্গতা কেড়ে নেবে, যা আমার সঙ্গে পৃথিবীকে বেঁধে দেবে অচ্ছেদ্য কিন্তু অনাসক্ত বন্ধনে, আমার জীবনকে দেবে একাধারে সঙ্গীতের ছন্দ আর গদ্যের মুক্তি, যা আমার জীবনধারণকে দেবে সুন্দর সঙ্গতি আর সন্দেহমুক্ত তাৎপর্য?

আমি পথ চলতে থাকলেম।

"...রঘুপতি রাঘব রাজারাম"

হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আমার সেই সহযাত্রীর সঙ্গে। বিষণ্ণ, বিমর্ষ ভদ্রলোক চলেছেন নিস্প্রাণ গতিতে। ট্রেণের সেই সাবধানী বিচক্ষণ ব্যবসায়ীকে চেনাই যায় না। যেন কী বিপর্যয় বয়ে গেছে জীবনের উপর দিয়ে। পায়ের তলা থেকে যেন সরে গেছে মাটি।

ভদ্রলোক বললেন, "কী খবর ?"

"আপনার কী খবর ?" আমি অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেম।

"খবর আর কী! কিছু আর বলবার নেই।" বহুভাষী ভদ্রলোক আজ কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

আমিও আর কিছু খুঁজে না পেয়ে বললেম, "আপনার সেই তিরিশ না তিন শো ওয়াগন টিম্বার, সে কি···"

"টিম্বারের কথা বলে আজ আর লজ্জা দেবেন না মশাই। আর মুখ দেখাবার উপায় নেই।"

ভদ্রলোকের এমন লজ্জার কারণ কী বুঝলেম না। ঠিক সময়ের মধ্যে বুঝি দিয়ে উঠতে পারেন নি সাপ্লাই, তাই বুঝি কনট্র্যাক্ট বাতিল হয়ে গেছে, না কি ক্যাশিয়ার পালিয়েছে টাকাকড়ি নিয়ে, না কি পুলিশের বা ইনকাম ট্যাক্সের চোখ পড়েছে তাঁর গচ্ছিত অর্থের উপর ?

অচিরেই বোঝা গেল যে এ সবের কিছুই হয়নি। এমন কি এ সব বিষয়ের তিনি উল্লেখ মাত্র করলেন না। আমার সঙ্গে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে যেতে যা বলতে থাকলেন, তার অল্পই আমাকে বলা। যেন নিজের মনে বলতে থাকলেন, "আর কিছু ভালো লাগছে না। আজ আমার ফিরে যাবার কথা কলকাতায়। অনেকগুলি জরুরী কাজ জমে আছে। কিন্তু উৎসাহ পাচ্ছিনে কিছুতেই। না গেলে অনেক লোকসান হবে ব্যবসায়। তবু মনে জোর পাচ্ছিনে, গিয়ে আবার সেই কাজের ঘানিতে মাথা গলাতে। হোক লোকসান! সেইটেই কি সব চেয়ে বড়ো ক্ষতি ?"

সে কী কথা ? এ কেমন পরিবর্তন ?

ভদ্রলোক আপন মনে বলে চললেন, "আচ্ছা, এমন লোকটাকে মারল কী করে সুস্থ-মস্তিষ্ক আর একটা লোক ? একবার হাত কাঁপল না, অবশ হয়ে গেল না সারা দেহ ? একবার নয়, দু'বার নয়, বার বার গুলী করতে পারল ওই অস্থি-সর্বস্ব বৃদ্ধকে। অমন লোককে !"

গত রাত্রের পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত করে বললেম, "ও তো পাগল ছিল।"

"তাই হবে। তাই হবে। ঠিক অবস্থায় পারে কি কেউ অমন কাজ করতে ? হতেই পারে না।"

ভদ্রলোক একটু শান্ত হলেন, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে মাত্র। আবার আপন মনে বলতে থাকলেন, "অবিশ্যি বেঁচে থেকেই বা করতেন কী ? আমরা কি কেউ তাঁর কথা শুনেছিলেম না কাজ করছিলেম সেই অনুযায়ী ? তিনি একা আর কী করতে পারতেন ?"

"অনেক কিছু। তাই নয় ?"

"সে কথা ঠিক। কিন্তু আমরা কী ভয়ানক স্বার্থপর দেখুন। আমরা তাঁকে দিয়ে হাজারো রকমের কষ্ট সহ্য করিয়ে, ত্যাগ করিয়ে, শাস্তি দিয়ে খাটিয়ে নিলুম। তাঁর নেতৃত্বে আর ত্যাগে স্বরাজ যেই কাছে এলো, হাতে এলো ক্ষমতা, অমনি আমরা মেতে উঠলুম দেশব্যাপী উন্মাদনায়। ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করলুম, ভাইকে উপবাসী রেখে ধনী হতে চাইলুম—পরের কথা বলছিনে একেবারে নিজের কথা

বলছে—বোনকে বঞ্চিত করলুম তার লজ্জা নিবারণের কাপড়টুকু থেকে। এই পাগলামিতে যোগ দিলুম সবাই মিলে। সবাই বলে—চাই, চাই, আমার এটা, ওটাও আমার !”

এই মত্ততায় যোগ দিলে না শুধু এক জন। তখন আর তাঁকে আমাদের প্রয়োজন নেই। অতএব মারো ওকে। ও যে আমাদের আনন্দের ব্যাঘাত ঘটায় বেসুরো কতগুলো সৃষ্টিছাড়া কথা বলে। ওর যে কাজ ফুরিয়েছে। মারো ওকে। বিদেয় করো বুড়োকে, থামাও বক্‌বকানি। আমাদের খেলায় যদি যোগ না দিল, যদি না মাতল আমাদের লুটে, কাজ নেই অমন আপদ রেখে। মারো ওকে।

আমি চুপ করে শুনছিলেম। অন্য সময় হলে বিস্ময়ে চমকে উঠতেম অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ীর এমন আত্মজিজ্ঞাসা আর আত্ম-অভিযোজন দেখে। বিস্ময় প্রকাশ করে তারিফ করতেম তাঁর বিলম্বিত সুবুদ্ধির, নয়তো উড়িয়ে দিতেম অসৎ ভণ্ডামি বলে। কিন্তু আজ, এখন, প্লিভায় মহাত্মার ছবি দেখে যেমন অসঙ্গতি প্রত্যক্ষ করিনি, তেমনি এই লোভী ব্যবসায়ীর কবুলতিও অনান্তরিক বলে উড়িয়ে দিতে পারলেম না। বরং মাথা হেঁট হোলো নিজেকে তাঁর বর্ণিত অপরাধের অংশীদার মনে করে।

“…রঘুপতি রাঘব রাজারাম”

হাত দুটো এতক্ষণ ছিল পকেটের মধ্যে। আবার বের করে দেখলেম। সেই লাল, সেই কালো। মোছেনি

কিছু। আমি 'আচ্ছা চলি' বলে বিদায় নিলেম ভদ্রলোকের কাছে! তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলেম।

"পতিত পাবন সীতারাম"। বহু জনের মিলিত কণ্ঠে ভজন চলেইছে। বিরাম নেই।

গায়ক-গায়িকার মধ্যে সাধু আছে যত, চোর আছে তার চেয়ে বেশি। এদের মধ্যে সৌহার্দ্যের চাইতে বিরোধ আছে সহস্রগুণ বেশি—জাতিগত, শ্রেণীগত, ভাষাগত, স্বার্থগত— এদের মধ্যে বেশির ভাগই গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করলেও সে অনুযায়ী কাজ করবার সাহস আছে অল্প সংখ্যকেরই। তবু, আজ এই মুহূর্তে এই যে সবাই মিলে কাঁদছে—আমি কাঁদছি—এর মধ্যে নেই এতটুকু কপটতা। এই যে শোক, এই যে পরিতাপ এ মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়।

"সবকো সন্মতি দে ভগবান···"

আমি ভাবছিলেম ভদ্রলোকের কথাগুলি। সত্যি কি চোখের জল ফেলবার অধিকার আছে আমাদের? গুলী করেছে এক অসুস্থ, অজ্ঞাত, অখ্যাত মারাঠী ব্রাহ্মণ। কিন্তু সেটাই তো পুরো সত্য নয়। নাথুরাম তো আমাদের অনুচ্চারিত বা অজ্ঞাত আজ্ঞার বাহক মাত্র। ওকে পাগল বলে ফাঁসি দিলেই কি আমাদের সকল অপরাধের স্খলন হয়ে যাবে? হাতের রক্ত মুছে যাবে?

হাত দুটো পকেটের মধ্যে পুরে আবার এগিয়ে যেতে থাকলেম সামনের দিকে। "রঘুপতি রাঘব রাজারাম।"

ক্ষমতার ছায়ামাত্র লাভ করে, সত্যি, কী অবিশ্বাস্য রকম বদলে গেলেম আমরা সবাই। সবাই মিলে কী অসম্ভব ত্বরার সঙ্গে বিস্মৃত হলেম সকল দায়িত্বের কথা। মনে রইল শুধু পাওনার কথা এটা আমার চাই, ওটা আমি না পেলে স্বরাজের অর্থ হোলো কী ?

কেউ কেউ বা বললে, দশ বছর জেলে ছিলাম কি অমনি ? আজ চাই তার ইনাম। অন্তত মন্ত্রিত্ব। জেল থেকে শুধু ওরাই ছাড়া পায়নি, ওদের লোভও।

তার চাইতেও কুৎসিৎ কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ক্ষমতা নিয়ে। নতুন ভারত গড়তে হলে আমাকে ওই আসনে আসীন না হলে চলবে কী করে ? হাতে ক্ষমতা না পেলে হাত লাগাবো কী করে কাজে ?

আবার কারো কারো বা দেশপ্রেম যদিবা রইল অক্ষুণ্ণ, বুদ্ধি হোলো বিভ্রান্ত। ওরা বললে, শক্তিশালী করতে হবে ভারতকে। তার জন্যে চাই বৃহৎ সেনাবাহিনী, চাই নৌবহর, চাই বিমানবাহিনী। যেন এই শক্তির বলেই গত কাল মাত্র হারিয়ে দিয়েছিলেম বিশ্বের দৃপ্ততম রাষ্ট্রকে ! যেন তার বড়ো শক্তির সন্ধান দেয়নি কেউ আমাদের !

এই দেশজোড়া পাগলামির মধ্যে একটি লোক শুধু একঘেয়ে সুরে বলতে থাকল—এ নয়, এ নয়। সে বদলাল না এতটুকু।

নাথুরাম তাই আমাদের হয়ে অবসান ঘটিয়ে দিল এই হাস্যকর অসঙ্গতির। কাঁদব কোন্ মুখে ?

"সবকো সন্মতি দে ভগবান।"

একবারও এরা ভাবলে না যে এই রাষ্ট্রিক শক্তির আলেয়ার পশ্চাতে ছুটে ছুটে সমগ্র য়ুরোপ—এবং এশিয়ার অনেকখানি —গত কয়েকটি মাত্র দশকের মধ্যে দু' দু'বার মারামারি কাটাকাটি করে শান্তি বা সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এই শক্তি পূজায় গোটা য়ুরোপ সব খুইয়ে আজ হাত পেতেছে আমেরিকার কাছে, নয়তো মাথা পেতেছে রাশিয়ার কাছে।

শেষে ভারতও কিনা বেছে নিল সেই সর্বনাশা পথ—যে-পথে গিয়ে সারা জগৎ আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। মহত্তর নেতৃত্বের দুর্লভ সৌভাগ্য সত্বেও আমরা সে ভুলের ফাঁদে পা দিতে চলেছি। ফলে আমরা না হতে পারব আমেরিকা, না রাশিয়া। দেশকে শক্তিশালী করবার নিঃসন্দেহ সদুদ্দেশ্য নিয়েই সকল ক্ষমতার আধার করে তুলব সরকারকে—ভুলে যাবো যে প্রতিটি নাগরিক স্বতন্ত্রভাবে শক্তিমান না হলে দেশ শক্তিশালী হয় না, তিরিশ কোটি শূণ্য যোগ করলে যোগ-ফল তিরিশ কোটি হয় না, শূন্যই থাকে। তারপর একদিন—এবং সেদিন খুব দূরে নেই—বর্তমানের গান্ধীপ্রেরণাধন্য নেতৃ-বৃন্দের শীর্ষস্থানীয়গণ মঞ্চ থেকে বিদায় নেবেন কালের অমোঘ আদেশে। সেদিন বাকী রইবে কী? সরকারের হস্তে ন্যস্ত সকল ক্ষমতা থাকবে সেখানেই—শুভবুদ্ধিশূন্য প্রবলের ব্যবহারের জন্যে। এদিকে ব্যক্তি, অর্থাৎ সারা দেশ, যেমন দুর্বল ছিল তেমনি থাকবে! অর্থাৎ ভারত চীন হবে!

আচ্ছা, সেই দীর্ঘ তিরিশটা মিনিট—যখন নাথুরাম

তার কাজ শেষ করেছে কিন্তু সব কিছু শেষ হয়ে যায়নি—তখন কী ভাবছিলেন মুমূর্ষু মহাত্মা? "হরিজনের" পরবর্তী সংখ্যায় থাকবে না তার M. K. G.-স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন। কিন্তু তবু জানতে ইচ্ছা হয়। অনন্ততমিস্র সেই অবচেতনতার আচ্ছন্নতায় তাঁর হৃদয় কি উদ্বিগ্ন হয়েছিল স্বদেশের ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায়? নিশ্চয় হয়েছিল। তাঁর আত্মা কি ক্লিষ্ট হয়েছিল মানবজাতির অবশ্যম্ভাবী আত্মাবলোপনের আসন্নতায়? নিশ্চয় হয়েছিল। কিন্তু এই পৃথিবী—যাকে তিনি এত দিলেন এমন নিঃস্বার্থভাবে—সেই পৃথিবী থেকে একেবারে চরম বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে একবার, শুধু একবারের জন্যে, কি তাঁর মনে হয়েছিল নিজের কথা? নিজের জীবনের কথা?

তখন কী মনে হয়েছিল তাঁর? সমস্ত জীবনের কর্ম ব্যর্থ হয়েছে' না কি সার্থক হয়েছে? না কি সাফল্যে অসাফল্যে মেশানো—যেমন আর সকলের জীবন? ব্যর্থতা যতটুকু ছিল তার জন্যে অপর কাউকে—মানবজাতিকে—দোষী করবেন, এমন সামান্যতা ওই মহৎ অন্তরে অভাবনীয়। না কি যাবার কালে সন্দেহ হয়েছিল মঙ্গলসাধনের পদ্ধতি সম্বন্ধেই? একবার কি মনে হয়েছিল যে দল গড়ে ভালো করতে গিয়ে ভুল করেছেন? যে, ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় রাজনীতির মধ্য দিয়ে? একবার কি এই সন্দেহ জেগেছিল যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নেই মুক্তির সন্ধান? যে, বাইরে থেকে নেই সংসারের সংস্কারের স্থায়ী সমাধান? একবার কি এই সংশয় জেগেছিল যে জাগতিক, মানবিক পর্যায়ে সম্ভব নয় স্থায়ী শুভ? কী জানি।

কিন্তু এসব চিন্তায় স্খালন হয় না আমাদের অপরাধ। অপরাধ স্বীকার করলেও পূর্ণ হয় না প্রায়শ্চিত্ত! আরো অনেক থাকে করবার। কিন্তু করব কী?

সেই পুরানো প্রশ্ন। দল বেঁধে ভালো করতে গেলে ভালোর চেয়ে মন্দ ফলবে বেশি। সেই সংগঠিত মন্থনে অমৃতের চাইতে হলাহল উঠবে বেশি। আর একা চলতে গেলে তো নাথুরাম দাঁড়িয়ে আছে পথ রুখে। কী করব?

"জয় রঘু নন্দন জয় সীতারাম"

কলের জল নেই কোথাও কাছাকাছি। হাত দুটো মুহূর্তের জন্যে পকেট থেকে বের করে আবার লুকিয়ে রাখলেম।

হঠাৎ দেখলেম হাঁটতে হাঁটতে কখন মহাকালে উঠে গেছি। সেই সুড়ঙ্গের মুখটার কাছে, যেখানে দেখা হয়েছিল সেই ভক্ত নেপালীর সঙ্গে। আজ তাঁকে আমার বড়ো প্রয়োজন। তিনিই বলেছিলেন যে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের সামান্যতম সুকৃতিও ব্যর্থ হতে পারে না। তার ফল কোনো না কোনো দিন বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বেই পড়বে। তার পুণ্যে অংশ আছে সমগ্র জগদ্‌বাসীর। তিনিই বলেছিলেন, নিভৃততম অন্ধকারে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্রতম অন্যায়ও নয় নগণ্য, তারও ফল বিশ্ব-বিস্তৃত, তারও পাপে অংশ আছে সমগ্র জগদ্‌বাসীর।

হাত দুটোকে আরো ভালো করে পকেটে পুরে একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করলেম আমার বন্ধুর কথা। সহজেই বুঝতে পেরে বলল, "নেই তো। আর সাতজনের সঙ্গে আজ

সকালেই যে উনি যাত্রা করেছেন তিব্বতের দিকে। আর তো ফিরবেন না উনি।”

ফিরবেন না? আমাকে যে বলেছিলেন ওঁর সঙ্গে যাবার কথা। এবার আমি কোথায় যাবো? কি করব?

বসে পড়লেম আমি সামনের একটা পাথরের উপর।

এবার বাকী জীবন ধরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নাথুরামের পাপের। আমার নিজের পাপের। পালাবার উপায় নেই হিমালয়ের গুহায়।

যে দিন দার্জিলিং এসেছিলেম সেদিন হিমালয়কে মনে হয়েছিল অন্যতর জগতের উন্মুক্ত দ্বার। আজ তাকে মনে হচ্ছে প্রবেশরোধকারী প্রহরী বলে। স্থূল, অনচ্ছ, অনতিক্রম প্রাচীর বলে। দার্জিলিঙের সকল সৌন্দর্য নিমেষে নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমার চারদিকের সমস্ত জায়গাটাকে মনে হোলো বিরাট শ্মশান বলে, আক্ষেপ হোলো সত্যি তা নয় বলে।

কতক্ষণ বসেছিলেম জানিনে। সময় থেমে ছিল।

সূর্যটা পড়েছিল একটা মেঘের আড়ালে। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল দশ দিক্। সেই অন্ধকারের সুরেই আজকের দিনটি ছিল বাঁধা। তাই হঠাৎ চমকে উঠলেম তখনই যখন আবার রোদ উঠল, মেঘটা সরে গেল। সামনে তাকিয়ে দেখলেম সূর্য আছেন আপন অবিচল মহিমায়। ওইটুকু মেঘ কি পারে অত বড়ো সূর্যকে আড়াল করে রাখতে?

হঠাৎ মনে এলো অস্পষ্ট কয়েকটা কথা। নাথুরামের দেশবাসী আমি। তার কলঙ্কে আমার কলঙ্ক। কিন্তু আমি তো গান্ধীজীরও দেশবাসী, মহাত্মারও সন্তান। তাঁর পুণ্যে কি নেই আমার কিছুমাত্র অধিকার? তাঁর জীবনময় সুকৃতিতে নেই আমার সামান্যতম অংশ? ওইটুকু মেঘ দেবে এত বড়ো সূর্যকে অবলুপ্ত করে?

হতেই পারে না। হতেই পারে না।

কাল ফিরে যাবো। দার্জিলিঙের পনেরটা দিনের স্মৃতি রইবে চিরজীবনের মতো অম্লান হয়ে।

কলকাতা গিয়ে কী করব জানিনে। এখানে, এই হিমালয়ের তলায়, অজ্ঞাতের আমন্ত্রণের যে অদৃশ্য সংকেতের অস্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়ে গেলেম, হয়তো তার কোনো প্রভাবই রেখাপাত করবে না আমার কাল থেকে পরের দিনগুলির ছোটোখাটো অকিঞ্চিৎকর কাজের মধ্যে।

হয়তো বা করবে। তাহোলে আমার দার্জিলিং আসা ব্যর্থ হয় নি।

শেষ